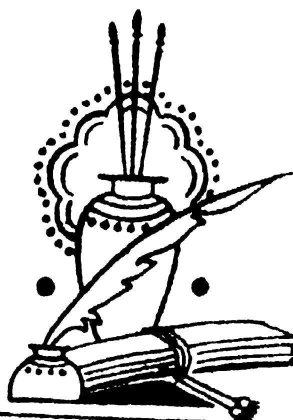
শিল্পীর নবজন্ম

• রম্যাঁ রলাঁ •

শিল্পীর নবজন্ম

প্রথম খণ্ড

অনুবাদ : সরোজকুমার দত্ত



অগ্রণী বুক ক্লাব

প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

প্রিণ্টার
অবনীমোহন পাল চৌধুরী
জাতীয় মুদ্রণ
৭৭ নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

প্রচ্ছদপট
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আড়াই টাকা





অনুবাদকের বক্তব্য

কাগজে দেখিলাম রমঁ্যা রলাঁর স্মৃতি-উদ্‌যাপনের আয়োজন হইয়াছে। উদ্যোক্তাগণ এই-সম্পর্কে সম্প্রতি গান্ধীজীর সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীও এই ব্যাপারে উৎসাহ দেখাইয়াছেন। বিলম্বে হইলেও এই প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নাই; প্রত্যেক ভারতবাসীর ইহার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করা উচিত।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও বিশেষ করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে রমঁ্যা রলাঁ ইউরোপে পরিচিত করিয়াছেন। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকেও তিনিই পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিয়াছেন সবচেয়ে গভীর ও ব্যাপকভাবে। জ্ঞানার্জনের নিছক কৌতূহল অথবা অনুন্নত দেশের প্রতি উন্নতসমাজের বুদ্ধিজীবীর অনুগ্রহদৃষ্টি লইয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রচারকার্য রলাঁ করেন নাই। গত মহাযুদ্ধের পর রুশবিপ্লবের মধ্যে রলাঁ পৃথিবীব্যাপী শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রথম সফল বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া উৎসাহিত হইয়া ওঠেন এবং সদ্যোজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে গোপন ও গভীর চক্রান্ত শুরু হয় তাহার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। কিন্তু শুধু ইউরোপের স্বাধীনতাই রলাঁর স্বপ্ন ছিল না। তিনি ছিলেন সত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদী। প্রাচ্যদেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ শেষ না হইলে যে,

রুশবিপ্লব অসম্পূর্ণ ও বিপন্ন থাকিয়া যাইবে—তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাই ভারতবর্ষে গান্ধীজী যখন প্রায় একই সঙ্গে তীব্র অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলেন তখন তিনি এই আন্দোলনকে রুশবিপ্লবের পরিপূরক হিসাবেই অভিনন্দিত করিলেন। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইউরোপে তীব্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং প্রাচ্যদেশে, বিশেষত ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে, বিদ্রোহের সূচনায় পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাহারা পাল্টা অভিযান শুরু করিলেন। বনিয়াদী সাম্রাজ্যবাদের দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে উগ্র অন্ধ এক জাতিবিদ্বেষী জাতীয়তাবাদে চোলাই করিয়া সমাজতন্ত্রের আকর্ষণ হইতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিলেন। ইহার নামই ফাশিজম্। গণতন্ত্রের কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ জমা হইতেছিল তাহারই সুযোগ লইয়া গণতন্ত্রকেই নির্মূল করা হইল। একটা নয়া ব্যবস্থার মুখোশ পরাইয়া পুরাতন ব্যবস্থাকে পাকা করা হইল, ধনতন্ত্রের দালালগণ দেশপ্রেমিক সাজিয়া গণতন্ত্রের ভস্মাবশেষ হাতে মাখিয়া শাসনরজ্জু ধারণ করিলেন। যুদ্ধ, মহামারী ও অন্নাভাবে উন্মাদ জনসাধারণকে লেলাইয়া দেওয়া হইল কমিউনিস্ট ও সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে। ফাশিজমের প্রথম বিকাশ হইল মুসোলিনীর ইতালীতে, পূর্ণবিকাশ হইল হিটলারের জার্মানীতে। সদ্যোজাত সোভিয়েট রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই গোপন হীন ষড়যন্ত্রের রূপ রলাঁর নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত মহাপুরুষ সোভিয়েট রাশিয়া ও বিশ্ববিপ্লবকে রক্ষা করিবার জন্য রাজনীতিতে ঝাঁপ দিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলেন তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির আত্মপ্রত্যয় লইয়া। ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীর রূপ তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ধনতন্ত্রী সমাজের স্বরূপ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বহু আঘাত, বহু বেদনা, বহু অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বর্তমান ইউরোপের এই শ্রেষ্ঠ মনীষী জীবনের সায়াহ্নে কমিউনিজমে বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন।

আমাদের দেশের রলাঁ-ভক্তের দল তাহার জীবনের এ-কাহিনী একেবারেই চাপিয়া যান। গান্ধী-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীকার নিরীহ এক ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী হিসাবেই তাহাকে পুস্তক-পত্রিকাতে, সভা-সমিতিতে চালু করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। রাশিয়া ও কমিউনিজমের নামও যে তিনি জীবনে কোনোদিন উচ্চারণ করিয়াছেন কিম্বা ফাশিজম্ লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন তাহার কোনো উল্লেখই করা হয় না। এদেশের যে কয়েকজন অধ্যাপক আন্তর্জাতিকতার বেসাতি করিয়া বাজারে বেশ পসার জমাইয়াছেন রলাঁ-সম্পর্কে তাহাদের প্রচারকার্য এক অদ্ভুৎ ধরনের। রলাঁর আন্তর্জাতিকতার কথা উঠিলেই তাহারা বলেন যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস করিবার মত 'সংকীর্ণতা' নাকি রলাঁর ছিল না, তাহার আন্তর্জাতিকতা নাকি ছিল সম্পূর্ণ ভাবজগতের। ভাবখানা এই যে, সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যেই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন খুঁজিয়াছেন; রাজনীতির কোলাহল তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এমন কি রলাঁর গতযুদ্ধের সময়কার রচনার অংশবিশেষ মূল হইতে সুবিধামত বিচ্ছিন্ন করিয়া কোনো প্রতিষ্ঠাবান সাময়িক পত্রিকায় সম্প্রতি ভারতীয় কমিউনিস্টদেরও একহাত লওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট রলাঁর চিঠিগুলি সংকলিত করিয়া সম্প্রতি বিশ্বভারতী হইতে এলেক্স আরনসন ও কৃষ্ণা কৃপালনীর সম্পাদনায় বাহির করা হইয়াছে। আমরা দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম পুস্তকের ভূমিকায় বা ভাষ্যে কোথাও

রলাঁজীবনের এই শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় কোনো উল্লেখ নাই। এমন কি নাৎসী বন্দীশিবিরে যে তাহার জীবনাবসান হইয়াছে তাহার পর্যন্ত উল্লেখ নাই। ১৯২৬ সালে যখন অতর্কিতে, অসতর্ক মুহূর্তে সরল মনে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর ফাঁদে পা দিতে গিয়াছিলেন, তখন রলাঁই সর্বনাশের সীমান্ত হইতে তাহার বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুনামকে রক্ষা করেন। পুস্তকখানিতে 'রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ' নামক যে অধ্যায় লিখিত হইয়াছে তাহাতে উভয় মনীষীর জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখ পর্যন্ত নাই দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। অথচ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জাপানী কবি নোগুচির নিকট লিখিত পত্রের প্রারম্ভে "That great French writer"-এর কথা পরম কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের দেশে যাহারা রলাঁ-বিশেষজ্ঞ এবং যাহারা রলাঁকে ভাঙ্গাইয়া অনেক খাইয়াছেন ও এখনও খাইতেছেন তাহারা তাহার জীবনের এই গভীর পরিণতির কথা যে জানেন না, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। *'I Will Not Rest'* নামক তাহার বিখ্যাত পত্র প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই। এই পুস্তক তাহার নিজের মুখে তাহার জীবনের এই পরিণতির কাহিনী। বিশ্বব্যাপী সমাজসংকটে, যুদ্ধ ও বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষণে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টের মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই পুস্তকখানির মূল্য অপরিসীম। এই পুস্তকের কথা রলাঁ-দরদীদের মুখে বড় শোনা যায় না। এ নীরবতা কানে লাগে।

'I Will Not Rest'-এর অনুবাদ আমরা প্রকাশ করিতেছি। ইহার মধ্যেই পাঠক রলাঁর নিজের মুখেই রলাঁ-জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিচিত্র কাহিনী শুনিতে পাইবেন। রলাঁর যে স্মৃতি-উদ্‌যাপনের আয়োজনের কথা আমরা প্রারম্ভেই উল্লেখ

করিয়াছি, আশা করি তাহাতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই সত্যকে গোপন করিবার চেষ্টা হইবে না।

রলাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের আত্মকাহিনী শুনিবার পূর্বে তাহার সাহিত্যিক ও জনজীবনের প্রধান ঘটনাগুলি জানিয়া রাখা ভাল মনে করিয়া আমরা এইসঙ্গে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিলাম। অনুমতির জন্য অধ্যাপক রায় ও 'পরিচয়' সম্পাদকের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমি ফরাসী জানি না, মূল ইংরেজী হইতেই এই অনুবাদ। ফরাসী নামের উচ্চারণগুলি সংশোধন করিয়া দিয়া ও আরো নানাভাবে সাহায্য করিয়া বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি অরুণ মিত্র মহাশয় আমাকে ও প্রকাশককে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই অনুবাদ প্রকাশের কৃতিত্ব প্রায় সম্পূর্ণই প্রকাশকের।

অমৃতবাজার পত্রিকা **সরোজকুমার দত্ত**
সম্পাদকীয় বিভাগ,
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

রম্যাঁ রলাঁ

(১৮৬৬—১৯৪৪)

রয়টারের তারযোগে রলাঁর মৃত্যুসংবাদ পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। গান্ধীজীর অনাস্থা সত্বেও এ দুঃসংবাদের প্রতিবাদ হয় নাই—প্রতিবাদের দুরাশা পোষণ করা কঠিন। রলাঁর তিরোধান, এই অকরুণ সত্যের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। কি ভাবে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এদেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে নাৎসী জার্মানীর নৃশংসতা তাহাকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাই রলাঁর এ মৃত্যুতে আমরা শোকের চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি গর্ব ও গৌরব। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে ফাশিস্টবাদের ও নাৎসী-তন্ত্রের বিরোধী ও সমালোচক রলাঁর মত এমন আর কেহ ছিল না। এতদিনে সেই কণ্ঠ ও সেই লেখনী চিরতরে রুদ্ধ হইল।

মনে পড়ে ১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর কথা। তখনও হিটলারের পালা শুরু হয় নাই, তাহার অগ্রজ মুসোলিনী আসর জমাইয়া বিরাজ করিতেছেন। পারীর বিপুল ফাশিস্ট-বিরোধী জনসমাবেশ। ইহার উদ্যোগকর্তা ছিলেন আলবের্ট আইনস্টাইন, আঁরি বারবুস, রম্যাঁ রলাঁ ও পল লাঁজ্ভ্যাঁ। আজ আইনস্টাইন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত, বারবুস ও রলাঁ অন্তর্হিত ও লাঁজ্ভ্যাঁ ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য।

বিশ শতকের সূচনা হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল

কথাসাহিত্যিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো চিন্তাজগৎ আলোকিত করেন আজ তাহাদের কথা স্মরণ করিলে রলাঁর অবিসংবাদিত প্রাধান্য স্বতঃই প্রতিভাত হয়। শ, ওয়েল্‌স্‌, গলস্‌ওয়ার্দি; য়োহান বোয়ের, ক্নুটহামস্থন, সেলমা লাগেরলফ; হাউপট্‌মান ও স্থডের-মান; মেতরলিংক ও দান্নুৎসিও—বর্তমানের চিন্তাজগতে ইহাদের কতটুকু প্রভাব! টমাস মান ও আনাতোল ফ্রাঁস বহুদূর পর্যন্ত রলাঁর পথের পথিক ছিলেন, পরে তাহারাও পিছাইয়া পড়েন। কেবল বারবুস ও গর্কির কথা স্বতন্ত্র। রলাঁর সহিত তাহাদের সম্বন্ধের কথাও আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে।

আধুনিক ফরাসী সংস্কৃতির পরিণত ফল রলাঁ,—এ উক্তিতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। প্রথম ফরাসী বিপ্লব এবং অধুনাতন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই দুয়ের মধ্যে আপন সংবেদনশীল সর্বগ্রাহী প্রতিভার সহায়ে রলাঁ সেতুবন্ধন ঘটাইয়াছিলেন। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জ্বলন্ত বাণী শিশু রলাঁর নিকট পৌঁছিয়াছিল নীরস স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নহে, ফরাসী বিপ্লবের চূড়ান্ত কবি ভিক্‌তর য়ুগোর জীবন্ত প্রভাবে। য়ুগোর মৃত্যুকালে রলাঁ প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। সৃজনী প্রতিভার শীর্ষবিন্দু অতিক্রম করিয়া গেলেও য়ুগোর রচনাক্ষমতা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্যিক ধারা রোমান্টিসিজম্‌, সেই রোমান্টিসিজম্‌-এর বহুমুখী প্রতীক ছিলেন ভিক্‌তর য়ুগো। কিন্তু ১৮৭০ সালে জার্মানীর হাতে লাঞ্ছিত পরাজিত বিধ্বস্ত ফ্রান্সে বিপ্লবের সে আবেগ সে উচ্ছ্বাস সে আত্মময়তার স্থান কোথায়? তখন যে যুগ আসিয়াছিল তাহা আবেগ সংকোচনের, আত্মসমীক্ষণের, নির্মায়িকতার, বিজ্ঞাননিষ্ঠার। তাই সে যুগের প্রতিভূ কবি লেকঁৎ দে লিল; য়ুগোর মৃত্যুর পর তিনিই ফরাসী আকাদেমীর "চল্লিশ অমরের" মধ্যে তাহার শূন্য আসনের

অধিকারী হন, তিনি ছিলেন রোমান্টিকতা-বিরোধী। তাহার মত ছিল এই—আর্ট সায়েন্স যদি নিতান্ত এক হইয়া না যাইতে পারে—তাহা হইলেও উহাদের যথাসম্ভব পরস্পরের নিকটে আসার প্রবণতা সর্বদাই থাকা উচিত।

বিজ্ঞানচর্চায় বিপ্লব ফরাসী দেশে শুরু হয় রলাঁর জন্মের দু'চার বছর পূর্বেই। ১৮৬২ সালে ডারুইনের যুগান্তকারী 'অরিজিন অব দি স্পিসীজ'-এর ফরাসী অনুবাদে তাহার সূচনা। যে দুইজন চিন্তানায়ক রেনাঁ ও তে'ন—তখনকার শিক্ষিত ফরাসীচিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাহারা দুইজনেই ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ। বিজ্ঞানের চোখ দিয়া রেনাঁ খৃস্টধর্মের বিশ্লেষণ করিতে গেলেন। ইহাতে রেনাঁ এমন সংকটে পৌছিলেন যে মৃদুহাস্যের সহিত তাহাকে স্বীকার করিতে হইল, 'আমার জীবন এখনও সেই ধর্মের অনুশাসনে চালিত যাহাতে আমার আর আস্থা নাই'। তে'ন বিশ্বাস করিতেন, সাহিত্যবিচারকেও প্রাণিতত্ত্বের মতো বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিকের সমাজের নিকট নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনাও এই সময়ের ফরাসী দেশে প্রকট হইয়া উঠে, প্রধানত টলস্টয় ও ডসটয়এভস্কির রচনাবলীর অনুবাদে তাহা আরম্ভ হয়।

তরুণ মেধাবী ছাত্র রলাঁ এই সঙ্ঘাতময় পরিবেশের মধ্যে বাড়িয়া ওঠেন। আর্টের বিভিন্ন বিভাগ—সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য, সংগীত,—ইহাদের প্রত্যেকের বিষয়ে তাহার আগ্রহ ছিল অপরিমিত, জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। পিয়োনো-বাদনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যুবক রলাঁ অচিরেই সুবিখ্যাত সোরবন শিক্ষালয়ের শিল্প-বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার গ্রন্থ এখনও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত।

১৮৯৭ সালে ফ্রান্সে সুধীবর্গ দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া গেলেন হঠাৎ এক বিস্ফোরণে—যাহাকে বলা হয় "ড্রেফুস ঘটনা"। একদল হইলেন জাতীয় ঐতিহ্যবাদী, ইহাদের নেতা মরিস বারেস ও শার্ল মোরা; অন্যদল আন্তর্জাতিক বিপ্লববাদী, তাহাদের নেতা এমিল জোলা ও আনাতোল ফ্রাঁস। প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও পরোক্ষভাবে রলাঁ দ্বিতীয় দলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

ইহার প্রধান কারণ, রলাঁর মানস-প্রকৃতি রূপায়িত হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের আদিম অনুপ্রেরণায়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্তরের অন্তর দিয়া সার্বভৌমভাবে। ইহার প্রয়োগে কোনরূপ বাধা তাহাকে অসহিষ্ণু করিত। জাতিতে জাতিতে বিরোধ এই মন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া তাহার চোখে ছিল অন্যায়, অসত্য ও সর্বথা পরিত্যজ্য। সাহিত্যিকের যে আত্মাভিমান তাহাকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, মৈত্রীর পরিপন্থী বলিয়া রলাঁ তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। এ প্রসঙ্গে তাহার বক্তব্য তিনি পরে তাহার "১৪ই জুলাই", "দাঁতঁ" প্রভৃতি নাটকে ও নাটকসম্বন্ধীয় আলোচনায় বিশদ করিয়া বলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জঁা জরেস-এর প্রভাব। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত ফরাসী জনসাধারণের ও বিদ্বৎ-সমাজেরও উপর এই সোশালিস্ট নেতার প্রভাব ছিল অনন্যসাধারণ। ইনি একদিকে যেমন ছিলেন জননেতা, অন্যদিকে ছিলেন বাগ্মী, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। ইহার যুদ্ধ-বিরোধী প্রচেষ্টার উপর রলাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে তিনি একসময়ে ভাবিতেন, অকস্মাৎ অজ্ঞাত-শত্রুর গুলির আঘাতে জরেসের অকালমৃত্যু না ঘটিলে হয় ত' ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধও স্থগিত থাকিতে পারিত—জার্মান ফরাসী শ্রমিক-সাধারণ জরেসের নেতৃত্বে শান্তি

অক্ষুণ্ণ রাখিত, যুদ্ধ বন্ধ করিত। অন্ততপক্ষে তাহার মৃত্যুতে শান্তির শেষ সম্ভাবনা রক্তাক্ত পরিণতিতে বিলীন হইয়া গেল।

রলাঁর সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'জাঁ ক্রিসৃতফ'। উহার রচনাকাল ১৯০৪—'১২। ইহার দুইটি প্রধান চরিত্রের একজন জার্মান সংগীতকার, অন্যজন ফরাসী সংস্কৃতিবিৎ। তাহাদের বন্ধুত্ব ও তর্কালোচনার ভিতর দিয়া রলাঁ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার তথা মানবসভ্যতার যে আসন্ন সংকটের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহারই অনিবার্য পরিণতি ঘটিল ১৯১৪ সালে। জরেস-প্রণোদিত সোশিয়ালিজম্-এর দিকে আকৃষ্ট হইলেও রলাঁ তখনও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাহার সত্যনিষ্ঠ-মন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ফলেই সেই সংকটের আসল রূপটি চিনিতে পারিয়াছিল। তাহারই ব্যাপক ও অকপট প্রকাশ হিসাবে জাঁ ক্রিসৃতফ চিরদিন সাহিত্যামোদীর শ্রদ্ধা অর্জন করিবে। কারণ, রলাঁর নায়ক ত' কেবল সংকটে নিষ্ক্রিয় দর্শক নন, তিনি যে বীর, তিনি যে যোদ্ধা, তিনি তাহার প্রাণ দিয়াও সংকটকে অতিক্রম করিতে উদ্‌গ্রীব। কোনো মিথ্যা, কোনো ছলনাই তাহাকে মোহাবিষ্ট করিতে পারে না। সত্যের এই অকুণ্ঠ অনুধাবন, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া এই অবিচলিত কর্তব্য সাধন—শেষ পর্বে গ্রাৎসিয়া-এপিসোডের মিস্‌টিক উল্লাস সত্ত্বেও ইহাকে বলা চলে জাঁ ক্রিসৃতফ-এর মূল সুর। এই সুরই তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন সহজ আশাবাদী টেনিসনের লাইনকে সামান্য পরিবর্তিত করিয়া—টু স্ট্রাইভ, টু সীক, নট টু ফাইণ্ড, নট টু ঈলড়। জানি, সংগ্রামে বিজয়ের আশা একেবারেই নাই। জানি নরলোক হইতে অনৃত্যের অন্যায়ের গ্লানি কোনোদিনই বিদুরিত হইবার নয়, তবুও প্রকৃত মনুষ্যত্ব যার আছে তার নিস্তার নাই, এই অসমান সংগ্রাম তাহার চালাইতেই হইবে, স্বার্থবুদ্ধির সমস্ত বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত রাখিতে

হইবে, ইহাই তাহার নিয়তির নির্দেশ, ইহাই তাহার ভগবানের বিধান, ইহার পালনেই তাহার চরম সার্থকতা।

জঁ। ক্রিস্তফ-এর বিষয়বস্তুর দাবী এমনই নির্মম যে দশখণ্ডব্যাপী বিরাট-কলেবর গল্পটিতে লঘু হাস্য-পরিহাসের স্থান নাই বলিলেই চলে। অথচ ফরাসীজাতির পরিহাসপ্রিয়তা, ফরাসী সাহিত্যের হাস্যরস সুবিদিত। হাস্যরস পরিবেশনেও রলাঁর যে কিরূপ দক্ষতা ছিল তাহা 'কোলা ব্রোইঞ' না পড়িলে উপলব্ধি করা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীর এই কাল্পনিক স্ফুর্তিবাজ বারগাণ্ডীবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর ভিতর দিয়া রলাঁ। যে হাস্যরস ফোটাইয়াছেন তাহা ঠিক সাধারণ লিপিচতুর লেখকের স্বল্পায়াসসাধ্য চমক-নৈপুণ্য নয়। তাহার তুলনা খুঁজিতে স্মরণ করিতে হয় রাবলে বা দিদেরো-কে। এ হাসিরও পিছনে আছে বৃহৎ সত্যাশ্রয়ী মন, যার কাছে কোনো ধারণাই এত বড় নয় যে তাহাকে লইয়া হাসা যায় না, কোনো প্রতিষ্ঠানই এত পবিত্র নয় যে তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করা চলে না; ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, মলিনতা বা বিদ্বেষ এ হাসির কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। মধ্যাহ্ন-সূর্যের দীপ্তির মতো ইহা যে কোনো বস্তুর রূপকেই যেমন উদ্ভাসিত করে, তৎসংলগ্ন ছায়াকেও তেমনি ঘনীভূত করিয়া দেখাইয়া দেয়।

কোলা ব্রোইঞ ১৯১৮-এ প্রকাশিত হইলেও রচিত হইয়াছিল ১৯১৪-এ। ১৪ সালের পর হইতে রলাঁর রচনার মোড় ঘুরিয়া যায়। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাহার পলিটিক্‌সে দীক্ষা হয় মহাসমরের প্রথম শোণিতধারায়। তাহার পূর্বে তাহার মতে পলিটিক্স ছিল হীনজনের ব্যবসায়। কবি যারা, শিল্পী যারা, মনস্বী যারা তাদের স্বাভাবিক আবাস হইবে স্বপ্নের জগতে, কল্পনালোকে। জার্মান কবির অনুসরণে তিনিও গাহিতে পারিতেন, "মাইন রাইশ ইস্‌ট ইন ডের

লুফ্‌ট”—আমার রাজত্ব উচ্চাকাশে। তখন তাহার কাছে প্রধান সমস্যা ছিল কি উপায়ে এই উচ্চাকাশের সহিত ধরণীতলের সংযোগ-সাধন করা যায়। টলস্টয় লিখিয়াছিলেন, যে-আর্ট মাত্র জনকয়েককে তৃপ্তি দেয় জনসাধারণকে তুষ্ট করে না তাহা গ্রেট আর্ট হইতে পারে না। ইহা পড়িয়া অধ্যাপক রলাঁ। বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ত' ভালো করিয়াই জানেন কতখানি সাধনা ও প্রতিভা থাকিলে গ্রেট আর্টের আবিষ্কৃত মর্মগ্রহণ সম্ভব হয়। অথচ ইহাও ত' স্পষ্ট যে গ্রেট আর্টের মহিমা যদি মুষ্টিমেয় এলিট-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই আর্টের সামাজিক মূল্য কতটুকু হইয়া দাঁড়ায়। সন্দেহের ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসুভাবে, বিনীত ছাত্রের মতো রলাঁ। টলস্টয়কে পত্রে প্রশ্ন করেন ও টলস্টয় উত্তরে তাহাকে অবজ্ঞা না করিয়া ধৈর্যের সহিত আপন প্রতিপাদ্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন। অবশ্য পত্রালাপে সাহিত্য-বিচারের এই মূলগত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় নাই; বস্তুত তখনকার একান্ত ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবহাওয়ায় তাহার প্রকৃত সমাধানের সন্ধান পাওয়া টলস্টয় বা রলাঁ। কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি এই সূত্রে অন্তত একটি শিক্ষা রলাঁ। টলস্টয়ের নিকট হইতে পাইলেন যে, জনসাধারণকে তুচ্ছ করাই সাহিত্যিক আভিজাত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ নয়; বৃহৎ সাহিত্যের থাকা চাই এমন ব্যাপক আবেদন যাহা একই কালে কৌতূহলী পাঠক ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক দুয়েরই আনন্দের উপাদান যোগাইতে পারিবে। এই গ্রেট আর্টের রহস্য সাধারণ পাঠকের নিকট উদ্‌ঘাটিত করার উদ্দেশ্যে রলাঁ। লিখিয়াছিলেন তিনটি জীবনী-আলেখ্য—সংগীত, স্থাপত্য ও সাহিত্যের তিন দিকপালের—বেঠোফেন, মিকায়েল আন্‌জেলো ও টলস্টয়। বেঠোফেনের জীবনে, তিনি দেখাইলেন, সৎসাহসের প্রসারশক্তি, নৈতিক সংগ্রামে আনন্দের উদ্দীপনা, আপন

চেতনায় ভগবৎ-উপলব্ধির উন্মাদনা। মিকায়েল আনজেলোর জীবনে তিনি ফোটাইলেন একটি করুণ ট্রাজেডি—বিরাট সৃষ্টিক্ষমতার সহিত দুর্বল ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের ট্রাজেডি। প্রতিভার ক্ষেত্রেও দুর্বলতাকে যে সমর্থন করা যায় না—ইহা দেখাইতে রলাঁ কার্পণ্য করেন নাই। টলস্টয়ের জীবনে তিনি প্রকাশ করিলেন কেমন করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষীদলের দরদী কথক হইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়ে টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিনের অভিমত—এই অভিজাত কাউণ্টটির আবির্ভাবের পূর্বে রুশ সাহিত্যে খাঁটি 'মুঝিক'-এর কথা শোনা যায় নাই।

গ্রেট আর্টের প্রসারের সাহায্যে মানবিকতার বিস্তার, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি, রলাঁর এই সুখস্বপ্ন বিচূর্ণ হইয়া গেল ১৯১৪-এর ২৮শে জুনের বজ্রনির্ঘোষে, সারায়েভোতে অষ্ট্রিয়ার আর্চ-ডিউকের গুপ্তহত্যায়। ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে, জার্মান ও ফরাসী, পরস্পর নিবিড় বন্ধুত্ব করার পরিবর্তে কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে। যে সকল সাহিত্যিক এতদিন ধরিয়া মানবিকতার স্তবগানে ছিলেন মুখর, তাহারাই এখন তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণতর লেখনীর সঞ্চালনে যুদ্ধং দেহি রবে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, "মাই কান্ট্রি, রাইট অর্ রং"-মন্ত্রের মাদকতায়। জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে মানবতার এই অপমৃত্যু, রলাঁকে বিস্মিত করিল, ব্যথিত করিল। সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার অপরাধে তিনি দুইটি সভ্যজাতিরই বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে হইল। নিরপেক্ষ সুইট্‌সারল্যাণ্ড-এর উচ্চতা হইতে যুধ্যমান জাতি দুইটির উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলি "যুদ্ধের উর্ধ্বে" নামক গ্রন্থে সংকলিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, রলাঁ শান্তিকামী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কাম্য শান্তি

যুদ্ধকে এড়াইয়া নয়, যুদ্ধের পাশবিকতাকে মানবিকতার অস্ত্রে নিহত করিয়া। সংস্কারমুক্ত যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীর সমবেত প্রভাবেই হত্যা-লালসাকে দমিত করা যায়, ইহাই ছিল রলাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাই ভের্সাই সন্ধিতে ইউরোপের রাজনীতিতে শান্তি আসিলেও রলাঁর মনে শান্তি আসিল না। সন্ধিপত্রের অন্তরালে আবৃত ছিল যে দাবানলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাহার হৃদয়বান দৃষ্টিকে তাহা ঠকাইতে পারে নাই। তখনকার আশা-আকাঙ্ক্ষার, আশঙ্কা-উদ্বেগের কথাচিত্র লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তাহার 'ক্লেরাঁবো' নামক উপন্যাসে, যাহার নাম 'সকলের বিপক্ষে এক,' অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিবাদ।

মহাসমরের পরিসমাপ্তির পূর্বেই পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটিয়া গেল এক অভূতপূর্ব ঘটনা, উহাই রলাঁর বিশাল হৃদয়ের ভাবসমুদ্রে সৃষ্টি করিল নূতন মন্থন ও আলোড়ন। রুশ বিপ্লবের সহিত নাড়ীর টান রলাঁ অনুভব করিয়াছিলেন একেবারে প্রথম হইতেই। এই প্রচণ্ড রাষ্ট্রিক বিক্ষোভ যে মূলত সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, ইহাতে সন্দেহ তাহার মনে একদিনও জাগে নাই। তবু তিনি ছিলেন বহুদিন পর্যন্ত রুশ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমালোচক। রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অভীপ্সা তাহাকে দুর্জয়বেগে আকর্ষণ করিলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রকাশ্য নির্মমতা তাহাকে নির্দয়ভাবে প্রহত করিত। তাহার মানসিক গঠন ও পরিণতির ইতিহাস ভাবিয়া দেখিলে ইহার জন্য তাহাকে অপরাধী করা যায় না। বরং বিস্মিত হইতে হয় তাহার ঔদার্যের পরিধিতে। তাহার শ্রেণীর অন্য লেখকের হৃদয় হইতে রুশ-বিপ্লব অনুরূপ সমর্থন পাইয়াছিল? সত্য বটে তখনকার ফ্রান্সের অন্যতম খ্যাত লেখক আঁরি বারবুস রুশ বিপ্লবকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য বারবুস ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিলেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে বারবুস

রলাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন ও তাহার ছিল সমরাঙ্গনে সৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি-বিচার লইয়া বারবুস-পরিচালিত 'ক্লার্তে'-গোষ্ঠীর সহিত রলাঁর যে বিতণ্ডার উদ্ভব হয় তাহার তিক্ততার জন্য দায়িত্ব হইতে প্রথমোক্ত দলকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া যায় না। সোভিয়েট-সমালোচনায় সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধিতা হইতে রলাঁর বিপক্ষতায় যে মৌলিক ভাবগত পার্থক্য আছে তাহা বারবুস-এর দল না মানায় রলাঁ বিপর্যস্ত বোধ করিতেন। তিনি ভাবিতেন তিনিও ত' বারবুস-এর মতোই বিপ্লবী, রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া-শত্রুতা যে তাহারও ছিল চক্ষুশূল। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একান্ত উপাসক রলাঁ নির্বিত্ত শ্রেণীর একাধিপত্য মানিতে বাধা পাইতেন। ইতিহাসের যে অলঙ্ঘ্য দ্বান্দ্বিক নিয়মে ফরাসী বিপ্লবের ডিমক্রাসী রুশ বিপ্লবের ডিক্‌টেটরশিপ-এর পর্যায়ে পরিণত হয়, তাহা তখনও রলাঁর দার্শনিক দৃষ্টির বাহিরে ছিল। জানা নাই, তখন মার্কস-এর 'গোঠা' কর্মসূচীর সমালোচনা বা লেনিন-এর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থ দুটি তাহার হাতে পড়িয়াছিল কি না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের আচরণ সম্বন্ধে রলাঁর এই অপজ্ঞানের জন্য গর্কির দায়িত্বও কিছু কম নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তখন গর্কির প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত। রলাঁ তাহাকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করিতেন। রুশ সমাজের নিম্নস্তরের জন্য গর্কির গভীর সমবেদনা তাহাকে এক স্বতন্ত্র গৌরব আনিয়া দিয়াছিল। তাছাড়া গর্কি ছিলেন লেনিনের ঘনিষ্ট অন্তরঙ্গ। অথচ রলাঁ দেখিলেন, গর্কি সোভিয়েটকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। বারবুসের সহিত বিতর্কে রলাঁর অনেক মতের সহিত গর্কির মতের মিল ছিল। সুতরাং অকপট চেষ্টা সত্ত্বেও রলাঁ নিজের ত্রুটির সন্ধান পাইতেন না। কিন্তু গর্কির বোধি-

প্রাপ্তি হইল লেনিনের মৃত্যুতে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বরূপ তাহার ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অক্লান্ত অবারিত আত্মনিয়োগে তিনি নিজেকে ও সোভিয়েটকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন। গর্কির এই প্রত্যাবর্তন, সোভিয়েট রাষ্ট্রের দ্রুত উর্ধ্বগতি, ইউরোপ ভূখণ্ডে বিবর্ধমান বিশৃঙ্খলা পরে রলাঁরও দিব্যদৃষ্টি উন্মোচন করে।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার আগে পর্যন্ত রলাঁর ছিল আধ্যাত্মিক ঘুরপাক খাওয়ার পর্ব। ইউরোপের ভবিষ্যতে হতাশ্বাস হইয়া তিনি চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন মুক্তির সন্ধানের আশায়। হঠাৎ চোখে পড়িল আধুনিক ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ। ঐহিক শক্তিতে আস্থা হারাইলেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। রলাঁর পক্ষেও ব্যতিক্রম ঘটিল না। আপন স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সহিত তিনি তাহার নূতন আবিষ্কারের বাণী ইউরোপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারও মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাহার প্রকৃতিগত ঝোঁক আধ্যাত্মিক সমাধিমগ্নতার চেয়ে আদর্শনৈতিক কর্মযোগের দিকেই বেশি। তিনি বিশ্বাস করিতেন গান্ধীবাদের সহিত লেনিনবাদের সমন্বয় সম্ভব।

রলাঁর সংগ্রামপ্রবণ চিত্ত এ অবলম্বনে বেশিদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় রাজনীতির অগ্নিগর্ভ সমস্যার দাবীতে আধ্যাত্মিক জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রকট হইয়া পড়িল। তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে ইহার বিচিত্র গতি অনুধাবন করিতেছিলেন। ধূর্ত মুসোলিনীর মিষ্ট আপ্যায়নে প্রতারিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ফাশিস্টবাদের দীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশিত হইতে দিলেন। শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথের অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও রলাঁ তাহার চোখের ঠুলি

খুলিয়া দিয়া ফাসিস্টবাদের নগ্ন কদাকার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে বিরত হইলেন না। 'বিমুগ্ধ আত্মা' নামক উপন্যাস সিরিজে রলাঁর এই যুগের মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি গল্পাকারে চিত্রিত আছে। জাঁ ক্রিসতফ-এর যুগের দুর্নিবার আত্মবিশ্বাসের অভাবে এই উপন্যাসগুলি তাহার তুলনায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষখণ্ডে (লা'নোসিয়াত্রিস, ঘোষণাকারিণী) আছে পুত্র মার্ক-এর ফাশিস্টের গুলিতে অপমৃত্যুর পর মাতা আনেৎ-এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জনশক্তির সমাবেশের উদ্যোগ, দারুণ সংকটমাঝে নবজীবনের শঙ্খধ্বনি—ইহার সাহিত্যিক মূল্য রলাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম। এ-বই যে হিট্‌লার-রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে !

যতদূর জানা যায়, রলাঁ-র জীবিতকালে শেষ প্রকাশিত পুস্তক হইতেছে, "আমি থামিব না"। ১৯১৯ হইতে শুরু করিয়া পনের বৎসরের পরিভ্রমণের ইতিহাস এই গ্রন্থের বাইশটি প্রবন্ধ, একটি মুখবন্ধ ও একটি উপসংহারে নিবদ্ধ। ইহার অপর নাম, রলাঁ ইঙ্গিত করিয়াছেন, ষষ্ঠি-বর্ষীয়ের ডায়ারী। স্বাভাবিক বিনয়বশে তিনি মুখবন্ধে লিখিতেছেন : "এই পুস্তকে অত্যধিকভাবে 'আমি' 'আমি' করা হইয়াছে। কিন্তু যে 'আমি'-র বিবর্তন-কাহিনী এখানে বিবৃত হইল সে কেবল একা আমি নয়, সে আমাদের সমস্ত যুগ। আমাদের যুগ যে পথে চলিয়াছে, তাহার উদ্যম, তাহার যন্ত্রণা, তাহার বিভ্রম, তাহার অন্ধতা ও তাহার পুনরাবিষ্কৃত আলোক, আমার বিশ্বাস ইহার অনেকাংশ ইহাতে পাওয়া যাইবে।" বস্তুত যে সকল প্রশ্ন আমাদের যুগকে জর্জরিত করিতেছে যুদ্ধ, শান্তি, সাম্রাজ্যবাদ, ফাসিজম্, কমিউনিজম্—রলাঁর আলোচনা ইহাদিগকে লইয়াই। সমগ্র

মানবজাতির কোটি কোটি বৎসরের অর্জিত সভ্যতা আজ সংকটাপন্ন, মরণাপন্ন, সংরক্ষিত স্বার্থের বলদর্পিত রূঢ় অভিযানে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ অসহায়। এই সার্বভৌম সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীর কোনো পথ নাই নিরপেক্ষ থাকিবার। হাতের কাজ ও মাথার কাজ আজ একই সর্বনাশের সম্মুখীন। কর্মজগত ও ভাবজগত আজ অচ্ছেদ্যভাবে এক। তাহার মতে "কমিউনিজম্ হইতেছে বর্তমানে সামাজিক কর্মপন্থার একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী পার্টি যাহা, কোনো রফা না করিয়া ও কিছুই গোপন না রাখিয়া, পতাকা বহন করিতেছে এবং বিচারিত ও বীরোচিত ন্যায়পরতার সহিত পর্বতের উচ্চশিখর-বিজয়ের পথে চলিয়াছে।" তাই তিনি নির্দেশ দিতেছেন, "যে-শক্তি আজ পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িতেছে তাহার পক্ষে সক্ষম সৈনিকত্ব করার চেয়ে বড় কাজ মননশীল ব্যক্তির থাকিতে পারে না।" আজন্ম ভাববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুসরণের পর ষাট বছর বয়সে মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বনিয়াদ হইতে স্টালিনের নেতৃত্ব পর্যন্ত অকুণ্ঠে স্বীকরণ, সংস্কার-বিমুক্তির আত্মাভিমান পরিহারের এমন অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। এই মুক্তির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতে যে অন্তবিহীন পথ রলাঁকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহার নাটকীয়তাবর্জিত মর্মস্পর্শী কাহিনী অকপট আন্তরিকতার অনাড়ম্বর ঐশ্বর্যের সহিত বর্ণিত হইয়া এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। রলাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় এই বইটি আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এটিকে বাদ দিয়া রলাঁর মহত্ত্ব-বিচার এভারেষ্টকে বাদ দিয়া হিমালয়ের উচ্চতা বিচারের মতো নিরর্থক ও হাস্যকর।

এহেন লেখককে হাতে পাইলে হিট্‌লার তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন

অনুমান করা অসম্ভব নয়। ভুবনবিদিত বন্দীনিবাসে রলাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা এখন অপ্রকাশিত, কিন্তু তাহার বিফলতা সুপ্রকাশ। সেখান হইতে রলাঁর শেষ প্রকাশ্য উক্তি সাম্রাজ্যবাদের কারাগার হইতে গান্ধীজীর সসম্মান মুক্তিতে অভিনন্দন। পরাধীন ফ্রান্সের বাণীমূর্তি শৃঙ্খলিত ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দের কথা, ফরাসী জনগণের সমবেত বীরত্বে স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার তিনি দেখিয়া গেলেন। আক্ষেপের কথা, হিটলারী জার্মানীর উচ্ছেদ তাহার অগোচরে রহিয়া গেল, বিশ্বব্যাপী জনমুক্তির গৌরবময় ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতাকে হারাইল।

যে-সাহিত্যগুরু জীবন ভরিয়া মৈত্রী-সাধনা করিয়াছেন বুদ্ধের মতো, সত্যের ব্রতে প্রাণ দিয়াছেন সোক্রাটীসের মতো, তাহাকে প্রণাম।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

পরিচয়—মাঘ, ১৩৫১

শিল্পীর নবজন্ম

যুদ্ধ শেষ হইয়া শান্তি আসিল বটে, কিন্তু শান্তি আসিল না আমার মনে। সম্মুখে তখনও তীব্রতম সংগ্রাম। যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে ফ্রান্সে আমাদের সংখ্যালঘু দলটির প্রথম কর্তব্য ছিল যুদ্ধ যে কতবড় অপরাধ, কতবড় নির্বুদ্ধিতা তাহা দেখানো ও এইভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটানো। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কিন্তু যে-শান্তি আসিল তাহা শাশ্বত চিরন্তন যুদ্ধেরই বেদী রচনা করিল মাত্র; কারণ যুদ্ধ যাহারা জিতিল পরাজিতের প্রতি হিংস্র আক্রোশে বিদীর্ণ, বিক্ষত বিহ্বল পৃথিবীর বুকে যে কৃত্রিম শান্তির গুরুভার তাহারা চাপাইয়া দিল তাহাতে আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

স্পষ্টই বুঝা গেল পৃথিবীকে বাঁচিতে হইলে আরও অনেক নূতন যুদ্ধের মধ্য দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে অথবা এমন বিপ্লব তাহাকে বরণ করিয়া লইতে হইবে যাহার আঘাতে সমগ্র সমাজের বনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়িবে; কারণ এ সত্য আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে নির্বিবেক বণিকস্বার্থের ধনতন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদ আজ এতখানি বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, এই অতিকায় দানবের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কিছুতেই সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসিতে পারে না। যদি তাই পারিত তাহা হইলে যে-সকল রাষ্ট্রনেতার

হাজার দোষ সত্ত্বেও দেশপ্রেমের আন্তরিকতায় কেহ সন্দেহ করে না তাহারাই বা কেন ভের্সাই ও ত্রিয়ানঁর মত সন্ধিপত্র রচনা করিয়া ইউরোপকে এমন অবস্থার মধ্যে লইয়া যাইতেছেন যেখানে নূতন দারুণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, শুধু অবশ্যম্ভাবী নহে, যে যুদ্ধের ধ্বংসের হাত হইতে বিজেতা বা বিজিত কাহারও নিস্তার নাই? জানি পঁয়কার প্রাচীন পাকা উকীলের মত তাহার প্রতিপক্ষকে এতটুকু ক্ষমা দেখাইতে নারাজ, তথাপি এই ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা তাহার মনেও কি জাগে নাই? ক্ষোভে ও নৈরাশ্যে ক্লেমাঁসো যখন বলিয়াছিলেন 'আমার পশ্চাতে আসিতেছে মহাপ্লাবন', তখন কি গভীর অন্তর্বেদনায় এই নিদারুণ ভবিতব্যতাকে তিনি দেখিতে পান নাই? মৃত্যুর মধ্য দিয়া ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা কি তিনি করেন নাই? ব্রিয়াঁও এই দলের ব্যতিক্রম নহেন। যদিও বুদ্ধির গভীরতায় তিনি ইহাদের চেয়ে অনেক বড় এবং যাহার বলে তিনি জ্ঞাতিবিরোধ অবসানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তথাপি এই মিলন ঘটাইতে যে সততা, কর্মশক্তি ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, তাহা তাহার কোনোদিনই ছিল না। তাই ফ্রান্সের নামে এই সন্ধিনামাগুলির পরিবর্তন করিবার কালে তিনি নির্ভীকভাবে উদ্যোগী হইতে পারেন নাই। ইহারা সকলেই গণপরিষদের নেতা অথচ নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে নিজেদের মনের আবরণ উন্মোচন করিয়া ইহাদের কেহই দেখেন নাই, দূষিত ক্ষত পরীক্ষার ও অবিলম্বে উপযুক্ত প্রতিশেধক প্রয়োগের কর্তব্য এড়াইয়া তাহারা সকলেই পালাইয়া আসিয়াছেন। একথা কে না বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এমন একটি সমাজব্যবস্থার শোচনীয় অধোগতি তাহাদের পঙ্গু ও আচ্ছন্ন করিয়াছিল, যাহার সর্বদেহে মৃত্যুব্যাধির বিষাক্ত বীজাণু অথচ যাহার কবল হইতে

আপনাকে মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিবার সাহস ও শক্তি তাহাদের ছিল না।

এই সমাজব্যবস্থার সহিত আমাদের বন্ধন আমরা ছিন্ন করিয়াছি। ১৯১৯ সালের ঠিক পূর্বাহ্নেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম যে, সমাজবিপ্লব আমাদের প্রয়োজন কিন্তু এই প্রয়োজন-সাধনের জন্য সাংঘাতিক মূল্য আমাদের দিতে হইবে। দুঃখের মধ্য দিয়া, রক্তের মধ্য দিয়া রাশিয়ায় এই বিপ্লব আসিয়াছে। যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধবিরতির জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন, যুদ্ধ ও হানাহানির মধ্যেই তাহারা এমন একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানুষের জীবনকে ও ব্যক্তিগত বিবেককে সম্মান করাই যে ধর্মবিশ্বাসের প্রথম ও প্রধান বাণী। ভবিষ্যতকে বাঁচাইবার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া রাশিয়ায় যে নূতন প্রাণশক্তির অভ্যুদয় হইল তাহার সম্মুখে এই বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় অসহায় বোধ করিলেন। যে-দেবতাদের আশ্রয় করিয়া আমি এতদিন বাঁচিয়াছিলাম সেই মানবতার দেবতা ও স্বাধীনতার দেবতাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া একমাত্র বিপ্লবের দেবতাকে আমি বরণ করিতে পারিলাম না। কোলা ব্রুঞয় বলিয়াছিলেন, "মাত্র এক দেবতার পূজা লইয়া আমি থাকিতে পারিব না।" জাতির সহিত জাতির আত্মঘাতী যুদ্ধের মধ্য হইতে বাঁচাইয়া রক্তাক্ত বিক্ষত দেহ এই মহান শাশ্বত দুই দেবমূর্তিকে আমি বিপ্লবের শিবিরে আনিতে চাহিয়াছিলাম। সেদিন আমি ভুল করি নাই। সেদিনের মত আজও আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি, শ্রেণী-সংঘর্ষের আবর্ত হইতে যে নূতন শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাব হইতেছে সেই সমাজই অতীত জগতের বিরাট নৈতিক ঐতিহ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী; ভাঙ্গনের পথে পা বাড়াইয়া বুর্জোয়া সমাজ এই উত্তরাধিকার হইতে আপনাকে

আপনি বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু সেদিন বড় সঙ্কটের দিন। প্রাচীন ও নবীন দুই সমাজের মধ্যে তখন নিষ্ঠুর সংগ্রাম শুরু হইয়া গিয়াছে। "আগে যে-কোনোভাবেই হৌক বাঁচিতে হইবে, বাঁচিবার কারণ অনুসন্ধান হইবে পরে"—এই প্রবঞ্চনার কোনো স্বার্থকতাই যখন কোনোকালেই থাকিতে পারে না, তখন সংগ্রামও ছিল না। "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে" পুস্তকে এই প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধেই যুদ্ধরত জাতিগুলির প্রতি আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম।

অক্টোবর-বিপ্লবের যোদ্ধারা যে পথভুল করেন নাই, তাহারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন; কিন্তু ভুল আমিও করি নাই। আমি বলিয়াছিলাম সংগ্রাম ও পুনর্গঠনের কার্যে বিভিন্ন কর্মীদলের বিভিন্ন কাজ; বুদ্ধিজীবীদের কাজ মনের স্বাধীনতা রক্ষা করা, যাহাতে এই সংস্কারমুক্ত স্বাধীন মন লইয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হইতে দূরে দাঁড়াইয়া ব্যাপক দৃষ্টিপাতের ফলে সৈন্য পরিচালনা অভ্রান্ত হইতে পারে। আমার মতো বিপ্লবের আদর্শকে সত্য বলিয়া যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন ভুল আমি করি নাই। বিপ্লবের আদর্শে যিনি বিশ্বাসী একথা তিনি মানিবেনই যে, মনের মুক্তি যাহাতে আসে তাহাই সত্যোপলব্ধির সহায়তা করে।

কিন্তু যাহারা চিন্তার স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিয়া থাকেন তাহাদের কয়জনের এই বিশ্বাস এবং সর্বোপরি এই বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপান্তরিত দেখিবার আন্তরিক উৎকণ্ঠা আছে? ইহাদের মধ্যে কয়জন সত্যের সত্যকার উপাসক? সর্বস্বপণ করিয়া সংকল্পে অটল থাকিয়া সত্যের শেষ পর্যন্ত যাইতে ইহাদের মধ্যে কয়জন প্রস্তুত? বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই যে কর্তব্যপালন করেন নাই, দায়িত্বকে অবহেলা করিয়াছেন, স্বাধীনতার নামে স্বাধীন চিন্তাকে জনমতের

কর্ণধারগণের দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, তাহাদের দেওয়া সম্মান ও অন্নকে পরমোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ত' আমি যৌবনকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

যুদ্ধ ইহাদের মুখোশ খুলিয়া দিয়াছে। ইহারা যে কতখানি নিষ্ঠাহীন, চরিত্রহীন, যূথবদ্ধ পশুপালের মত কতখানি স্বাতন্ত্র্যহীন, যুদ্ধের কল্যাণে তাহা আজ দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। কিন্তু এই যুদ্ধের মধ্য দিয়া বুদ্ধিজীবীদের আরেকটি দলকেও লোকে চিনিতে পারিয়াছে। সংখ্যায় ইহারা অল্প, কিন্তু যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় ইহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের দেখিয়া লোকের মনে আশা জাগিয়াছিল যে, যুদ্ধের পরে এই দলটিকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটি সেনাবাহিনী গড়িয়া উঠিবে যাহারা সত্যের দাবীকে ভবিষ্যতের সর্বপ্রকার আঘাতের হাত হইতে রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করিবে। সত্যের দাবীই ত' সামাজিক সুবিচারের দাবী, আর কর্মের মধ্য দিয়া সত্যের বিকাশই ত' সামাজিক সুবিচার।

'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী'র (Declaration of Independence of Thought) মধ্য দিয়া আমি এই সৈনিকগণকে সম্মিলিত হইবার আহ্বান জানাই। ১৯১৯ সালের ১৬ই মার্চ এই ঘোষণাবাণী রচিত হয়, ২৬শে জুন 'ল্যুমানিতে' পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। একবৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা কয়েকশত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই ঘোষণাবাণীর মারফতই বুঝা গেল আমাদের এই সেনাবাহিনী কত শূন্য, কত ব্যর্থ, কত আত্মপ্রবঞ্চিত। এই আমার স্বপ্নভঙ্গের, আশাভঙ্গের প্রথম অভিজ্ঞতা, প্রথম হইলেও তীব্রতা ইহার কম নহে। যুদ্ধবিরতির পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম এইধরনের অভিজ্ঞতা আরও আমার ভাগ্যে আছে।

স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম নিরপরাধকে দণ্ডদানের দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করাই স্বাধীনতা নহে। সংঘর্ষের তপ্ত আবহাওয়া হইতে দূরে ধীর শান্তভাবে, সমগ্রভাবে বিচার করিয়া স্বচ্ছ যুক্তিবলে সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞাত উৎপীড়িত ন্যায়ধর্মের সেবায় নিয়োগ করাই প্রকৃত চিন্তার স্বাধীনতা। আমি লা ফন্টেনের সেই জ্যোতিষীর মত নই। যখনই কোন মজ্জমান ব্যক্তির আর্তনাদ আমার কানে আসে তখনই আমি বিপন্ন মানুষের সাহায্যে ছুটিয়া যাই; এবং যখনই দেখি (যেমন আজ দেখিতেছি) অন্য কেহ তাহাকে ডুবাইয়া মারিতেছে, বিপন্নকে বাঁচাইবার জন্য হত্যাকারীর সহিত সংগ্রাম করিতে আমি প্রস্তুত হই। এই কয়বৎসর আমি নির্জন পাঠকক্ষ হইতে বারম্বার ছুটিয়া সংঘর্ষের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; যে-চিন্তাকে ভাবিতাম 'সংগ্রামের ঊর্ধ্বে' তাহার সহিত যুদ্ধে প্রত্যক্ষ যোগদানের প্রয়োজনের আপাতবিরোধের সমাধান করিয়াছি।

১৯১৯ সালের প্রথম কয়মাস জার্মানীতে কয়েকটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া গেল,—লীবনেকৃট্‌ ও রোজা লুক্সেমবুর্গ নিহত হইলেন; বিজয়ী দেশের বুর্জোয়া শাসকগণের উদ্যোগে এবং জার্মানীর সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দল ও সমরলিপ্সু অভিজাতশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্পার্টাসিস্ট বিপ্লব দমন করা হইল। আমি সংগ্রামের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়া দাঁড়াইলাম।

৩১শে জানুয়ারী হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 'বার্লিনে রক্তাক্ত জানুয়ারী' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিলাম। প্রবন্ধগুলি ল্যুমানিতে পত্রিকায় (১৬ই, ১৭ই, ১৮ই, ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়) ও লাভনির

অ্যাঁতেরনাসিয়নাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে জার্মানীর হত্যাকাণ্ডের আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই। যদিও কোনো রাজনৈতিক দলের বাঁধাবুলি আমার ছিল না, তথাপি সত্যঘটনার নির্মম সাক্ষ্য আমাকে স্থির থাকিতে দিল না; আমি তীব্র নিষ্ঠুর ভাষায় সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের কলঙ্কময় ভূমিকাকে আক্রমণ করিলাম। পরে কমিউনিস্ট কাগজগুলিতে এইধরনের আক্রমণ চোখে পড়িয়াছিল এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে আমার এই আক্রমণের সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া জার্মান বিপ্লবীগণকে বিপ্লবের শত্রুদের হাতে সমর্পণের অন্ধ পৈশাচিক নীতি ফ্রান্স অনুসরণ করিতেছিল, সে-ইঙ্গিতও আমি ঐ সঙ্গে দিয়াছিলাম।

ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ ও প্রতিহিংসায় উন্মাদ যে সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীকে আজ আমরা চোখের উপর দেখিতেছি, ফ্রান্সের সেদিনের সেই নীতিই ত' তাহার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

রুশ-বিপ্লবকে ধ্বংস করিবার জন্য খাদ্যপ্রেরণে বাধা দিয়া তাহাকে মারিবার জন্য মিত্রশক্তিপুঞ্জ, মধ্য ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অর্থাৎ এককথায় ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণীর সম্মিলিত চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া ১৯১৯ সালের ২৬শে অক্টোবরের ল্যুমানিতে পত্রিকায় আমি এক প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

তথাপি, এই সংগ্রামের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকিয়াও আমি স্বাধীন চিন্তার দুর্গটিকে রক্ষার চেষ্টা করিতে থাকি। এই স্বাধীনতাকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের 'গজদন্ত মিনার' ভাবিবার কারণ নাই। পরন্তু ইহাকে আমি বিপ্লবেরই একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবেই দেখি। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শ্রমজীবী জগতের মধ্যে পরস্পরকে বুঝিবার ভুল

হইতে যে মারাত্মক সঙ্কটের আবির্ভাব হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে আমার সমস্ত মন তখন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল; কারণ এই ভুল বুঝা উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুর সামিল। যুদ্ধ ইতিমধ্যেই দুইয়ের মধ্যে বিভেদের গভীর পরিখা খনন করিয়াছে, যুদ্ধ-পরবর্তী কয়েক বৎসরের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে এই পরিখা রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তাবাদ ও বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের মত এতবড় সক্রিয় বান্ধব আর নাই।

১৯১৯ সালের আগস্ট মাসে ই. ডি. মরেলের মারফত ব্রিটিশ জনগণের উদ্দেশ্যে আমি "চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর ব্যাখ্যা" পাঠাই। উহাতে লিখিয়াছিলাম "জনগণের মধ্য হইতেই বুদ্ধিজীবীদের জন্ম, অতএব জনগণের স্বাভাবিক নেতা হইবার কথা তাহাদেরই, অথচ তাহাদের সম্পর্কে জনগণের মোহ আজ একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিছুকাল রাশিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর নিপীড়ন চলিয়াছে তাহার কারণও ইহাই। এই নিপীড়ন থামিয়া গেলেও অবিশ্বাস দীর্ঘকাল যাইবে না। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীতেও এই ব্যাপার চলিতেছে, যদিও তীব্রতা কিছু কম।" মসীজীবীদের সহিত শ্রমজীবীদের এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে আমি তাহার উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছিলাম। এক দলের ছিল 'শোষকশ্রেণীর হাতে নির্যাতনের উপকরণ' হইবার সম্ভাবনা (হইয়াছেও তাহাই), অপরদলের বিপদ ছিল 'পথ দেখিবার আলো হইতে বঞ্চিত হইয়া' উচ্ছৃঙ্খল সংগ্রামে আত্মবিনাশের পথ প্রস্তুত করা, সর্বপ্রকার স্থায়ী পুনর্গঠনের আয়োজন ব্যর্থ করা।

তাই আমি চাহিয়াছিলাম পরস্পরকে ভুল বুঝিবার এই সাংঘাতিক সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে। আমার সমস্যা ছিল

স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সহিত সর্বহারা শ্রমজীবীদের কর্মক্ষেত্রের সংযোগসাধন। ফরেন এফেয়ার্স পত্রিকার ১৯১৯ সালের আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত "আমার ঘোষণাবাণীর ব্যাখ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে কাহার কি কাজ হইবে তাহার একটা মোটামুটি খসড়া দিয়াছিলাম। এই খসড়াটি ছিল এত সাধারণভাবের যে, ইহার বাস্তব মূল্য কিছুই ছিল না; কেবলমাত্র উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা যে বিষাক্ত ভাবধারা প্রচার করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে এবং জাতীয়তাবাদরূপী মরীচিকা ও সর্বপ্রকারের নির্যাতনমূলক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস নিষ্ঠুর সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই ছিল আমার মতে বুদ্ধিজীবীদের প্রথম ও প্রধান কথা। সর্বহারা শ্রমজীবী যে পথ প্রস্তুত করিবে তাহাকে আলোকিত করাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ।

ই. ডি. মরেলের নিকট লিখিত আরেকখানি চিঠিতে আমি (১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ) আমার তখনকার চিন্তা ও কর্মধারা বিশ্লেষণ করি। চিঠিখানি ছিল অস্বচ্ছ, অস্পষ্টধরনের। বাস্তব সংগ্রামের অভিজ্ঞতাহীন ভাববাদী বুদ্ধিজীবীদের বাক্যে ও কর্মে এই অস্পষ্টতা আসিবেই। কিন্তু মূল বক্তব্যে কোনো আপোসের স্থান ছিল না। শ্রমিকবিপ্লবের পথে যে "পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিকতা" আসিবে আমি তাহার কথাই বলিয়াছিলাম। আমি লিখিয়াছিলাম, "আমার বিশ্বাস মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের জন্য শ্রমিক-শাসনের অভিমুখেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে।"

অপরপক্ষে এই চিঠিতে বুদ্ধিজীবীদের বিশেষধরনের কর্তব্যের দাবী ছিল, যাহা মিটাইতে গেলে প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতার, কারণ এই স্বাধীনতা ছাড়া সত্যের সন্ধান অসম্ভব। সর্বদেশের স্বাধীন বুদ্ধি-

জীবীদের লইয়া গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কল্পনা তখন আমার মনে ছিল। ইচ্ছা ছিল "যে-সকল বুদ্ধিজীবী যুদ্ধপন্থী জাতীয়তাবাদীদের খাতায় নাম লিখাইয়া তাহাদের সর্বপ্রকারের অপকর্মে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই সঙ্ঘ তাহাদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়া 'মননজীবী-দের বিশ্বসঙ্ঘের' মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিবে।" আমি চাহিয়া-ছিলাম "এই সঙ্ঘের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সমালোচনাকেন্দ্র, আন্তর্জাতিক ছাত্রসমিতি ইত্যাদি, অর্থাৎ এককথায় বিশ্বব্যাপী এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যাহা ভবিষ্যৎ সমাজের মস্তিষ্কের কাজ করিবে।"

এইসব পরিকল্পনার কি পরিণতি হইয়াছে তাহা আজ জানা কথা। কতকগুলি চতুর প্রতিক্রিয়াশীল দল ইহা আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ বিশ্বসঙ্ঘের অভাব নাই—Institutes of Intellectual Co-operation, the Permanent of Literature and Arts, Pan-Europas রহিয়াছে। ব্যবসায় ও বুর্জোয়া আদর্শে পরিচালিত গভর্নমেণ্টগুলির আশ্রয়ে এইগুলি পরিপুষ্ট। (দুই আদর্শের একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না)। যে সকল স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে স্পষ্টভাষণের জন্য সকলে ভয় করে এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে কৌশলে তাহাদের বাহিরে রাখা হইল। ভিতরে রহিলেন তাহারা বুদ্ধিজীবীজগতে প্রতিক্রিয়াশীলতার যাহারা প্রতিনিধি; সঙ্গে রহিলেন লেখাপড়া লইয়া ব্যস্ত-থাকা নিরপেক্ষের দল, আর এমন কতকগুলি দেশ যাহারা সব ব্যাপারেই সগৌরবে নীরব থাকেন। অতএব যুদ্ধের মধ্যে মহৎ আদর্শগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার যে সংগ্রাম আমরা করিয়াছিলাম, তাহার ফলটুকু যুদ্ধের পরে আমাদের চরমতম শত্রুরাই হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই সকল আদর্শের

সাংঘাতিক শক্তি বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই তাহারা একমুহূর্ত সময় নষ্ট করে নাই।

আইনকানুন স্বাধীনতা ও সভ্যতাকে যুদ্ধের মধ্যেই ত' তাহারা চুরি করিয়া লইয়াছে : গণতান্ত্রিক ভাবধারা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদর্শগত প্রবঞ্চনার বৃদ্ধিও ত' কখনও থামে নাই।

এই পাশকাটানো আক্রমণকে প্রথম হইতেই প্রবলভাবে বাধা দিবার প্রয়োজন হইল। আমার লিলুলি (Liluli) নামক পুস্তকে আমার সাধ্যমত বাধা আমি দিলাম। বইখানি যুদ্ধের মধ্যেই জেনেভায় বসিয়া লিখি এবং সেখান হইতেই উহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই-টুকুই যথেষ্ট নহে। সূক্ষ্ম বিদ্রূপ খুব কম লোককেই বেঁধে! যুদ্ধের জন্য চাই আরও মোটা হাতিয়ার। আমাদের প্রয়োজন ছিল ভারি কামানের; কিন্তু ঘাঁটি-রক্ষার উপযোগী শক্তি আমাদের ছিল না। যুদ্ধের কয়েক বৎসরের অগ্নিপরীক্ষা হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের অনেকে ব্যাধি ও মৃত্যুর কবলে পতিত হন। যুদ্ধবিরতি এবং শান্তির সন্ধিস্বাক্ষরের মাঝামাঝি সময়টাতে আমাদের শ্রেষ্ঠ সহকর্মী অনেকেরই জীবন তেল-ফুরাইয়া-যাওয়া প্রদীপের মত নিভিয়া গেল।

চারিদিকে শোকের ছায়া, নিজে বিয়োগবেদনায় কাতর, এই ভাবে দুইটি বৎসর আমি মৃত্যুর সাথে কাটাইলাম। আমাদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য অটুট ছিল তাহারা নৈতিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। মানুষ যে কতখানি হীন, কতখানি নির্বোধ, কতখানি পশু এবং কতখানি উদাসীন হইতে পারে, তাহা এবার তাহারা চোখের উপর দেখিয়াছিলেন। মানবতায় তাহাদের আর বিশ্বাস ছিল না। তাহারা মানুষের সংস্পর্শ হইতে পালাইয়া গেলেন, পালাইয়া গেলেন সেই আন্দোলনের মধ্য হইতে যে আন্দোলন তাহাদিগকে মানুষের সাথে

মিলাইতে পারিত। যে-কপটতাকে তাহাদের আঘাত করা, আক্রমণ করা উচিত ছিল সেই কপটতার প্রতি নিবিড় ঘৃণাই তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া দিল, বাকি যাহারা রহিল তাহাদের এতখানি তীব্র অনুভূতি না থাকার ফলে বিরুদ্ধদলের আমন্ত্রণে তাহাদের সহিত একটা আপোস-নিষ্পত্তি করিয়া নিল। মনকে বুঝাইল যে আদর্শকে তাহারা রক্ষা করিতে চাহিতেছে "সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের" মধ্যে তাহার প্রচার করাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ।

অবশ্য ইহাকে পুরাপুরি আত্মপ্রবঞ্চনা বলা চলে না, এবং প্রাণপণে এই আদর্শকে সত্যই যদি তাঁহারা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন তবে তাঁহাদের কাজের একটা সার্থকতা থাকিত। (অবশ্য বেশিদিন ইহা চলিত না, অতি শীঘ্র নূতন বন্ধুদের বন্ধন ছিঁড়িয়া আসিতে তাহারা বাধ্য হইতেন)। কিন্তু তাহারা অতি সাবধানীর সতর্ক পন্থা অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। বুদ্ধিমানের মতো চুপ করিয়া যাওয়া বেশ লাভের ব্যবসা, অতএব শীঘ্রই তাহারা দল ছাড়িয়া দিলেন। যে সামান্য কয়জন বিরোধীদলে যোগ দিল না, অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একনিষ্ঠ সৈনিকের মত যাহারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে বিরত হইল না, তাহাদেরও মানসিক জীবনে এমন একটি গভীর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যাহার ফলে তাহাদের সমস্ত কর্মোদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখীন হইবার প্রয়াসে এক মুহূর্তে বাম হইতে একেবারে দক্ষিণে চলিয়া গেল। ক্লার্তে-দলে মধ্যে যে দ্বিধা ও অসঙ্গতি দেখা দিল তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। এই দলটি অবশ্য তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত অক্লান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত বিপ্লবীবাহিনীর পুরোভাগে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ১৯১৯ সালের সেই পথ খোঁজাখুঁজির প্রথম কয়েক

মাস ক্লার্তে-দলও সংশয়দোলায় দুলিয়াছিল, এবং দ্বিধাদ্বন্দ্বের নাগপাশ হইতে সবলে আপনাকে ছিন্ন করিয়া স্থির ও সুস্থ থাকিতে পারে নাই, একেবারে অসহিষ্ণু চরমপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল। বারবুস ও মার্সেল মার্তিনে প্রমুখ তাহাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীগণ চিন্তার স্বাধীনতাকে তুচ্ছ করিয়া বিপ্লবের পায়ে এই স্বাধীনতার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণ ইতিপূর্বে তাহারা নিজেরাই করিয়াছিলেন।

বিপ্লব ও চিন্তার স্বাধীনতা ইহাদের কোনোটিকেই আমি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম না, এই দুইটিকেই একসঙ্গে রক্ষা করিতে করিতে আমার সর্বশক্তি ব্যয় হইরাছে। তখনকার দিনে কোনো দলে না থাকাটা ছিল সবচেয়ে নিরানন্দ কাজ, যে-কাজে কোনো পুরস্কার ছিল না, বাহবা ছিল না, স্বীকৃতি পর্যন্ত ছিল না। বিপ্লবীদের অন্ধ আপোস-হীন মনোবৃত্তির সহিত চিন্তার স্বাধীনতার তখন সংঘর্ষ শুরু হইয়া গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার বিপ্লব যখন আত্মরক্ষার জীবনমরণ সংগ্রামে রত সেই চরম সঙ্কটসঙ্কুল কয়েক বৎসর বিপ্লবীদের এই অন্ধ অনমনীয় মনোভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠে। বিপ্লবের এই অতিরিক্ত দাবীর ফলে স্বাধীনতার আদর্শবাদীদিগের বিরোধিতা না কমিয়া বরং এতখানি বাড়িয়া গেল যে, তাহারা সংগ্রাম হইতেই একেবারে দূরে সরিয়া যাওয়ার কথা পর্যন্ত বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

পৃথিবী ব্যাপিয়া তখন হিংসার তাণ্ডব চলিয়াছে; ইহার নিকট যাহারা তাহাদের সত্তাকে বলি দিতে অস্বীকার করিলেন—জাতিগত বা শ্রেণীগত সর্বপ্রকার দেশপ্রেমের এবং জাতীয় অথবা সামাজিক সর্বপ্রকার একনায়কত্বকে যাহারা বিনাদ্বিধায় বর্জন করিলেন তাহাদের নিকট আমার ক্লেরাঁবোল (Clerambault) মহাপুরুষ ও শহিদ হইয়া

গেল। "সবার বিরুদ্ধে একাকী" (ইহাই বইখানির প্রথম নামকরণ করিয়াছিলাম)—অর্থাৎ স্বাধীন বিবেক, স্বাধীনতার পায়ে যাহা আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। বারবুসের পত্রিকা মঁদ-এ (Monde) তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া (১৯২০ ডিসেম্বর ও ১৯২১ জানুয়ারী) তৎক্ষণাৎ বেরনিয়ে উহাকে শেষ করিয়া দিলেন। বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধী (conscientious objectors) সকল ফরাসীই এই বইখানিকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তখনও ইহাদের সংশয় ও দ্বিধা ছিল।

ইহার অল্পকালের মধ্যেই আমার চিন্তাগগনের দিগন্তে গান্ধীর সুদূর তারকা দেখা দিল। এই তারকার আলোককেই আমি পরে সমস্ত ইউরোপে প্রতিফলিত করি।

৩

১৯২০ সালে ডিসেম্বরে তুর (Tours) কংগ্রেসে ফরাসী সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হইল। লঁগে (Longuet) ছিলেন আমার বন্ধু। ব্লুম্ (Blum) ও রেণোদেলের (Renaudel) সহিত যোগদান না করিতে অনুরোধ করিয়া তাহাকে আমি পত্র লিখিলাম। এমন কি তাহাকে আমি জন-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পর্যন্ত অনুরোধ করিলাম! সকলেই জানেন সে-অনুরোধ তিনি রাখেন নাই। তিনি আমাকে পপুলেয়র (Populaire) পত্রিকায় টানিবার চেষ্টা করিলেন। তখন ল্যুমানিতে পত্রিকায় আমার লেখা প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিলাম

(১৯শে মার্চ ১৯২১), জানাইলাম তাহার পত্রিকা যে পন্থা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে আমার সম্মতি নাই। "যে পাপ বিরোধের ফলে সমাজতন্ত্রের দুইটি অংশ বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে" তাহার মধ্যে আমি থাকিতে চাহিলাম না।

সে কয় বৎসর আমার প্রধান কাজ হইল ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবী বামপন্থী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং ফ্রান্সের বাহিরে সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাবীরদের লইয়া একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গঠন করা।

আমার এই দ্বিমুখী অভিযান ব্যর্থ হইয়া গেল রাজনৈতিক দলগুলির পরম অসহিষ্ণুতার জন্য। হিংসার নিকট মনের এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে আমি সে-সময় (১৯২১-১৯২২) অবিশ্রাম অভিযান চালাইয়াছিলাম। তখনকার দিনের সে-উন্মত্ততার মধ্যে এই হিংসাকে শুধুমাত্র অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইত না, উহাকে পতাকার সম্মান দেওয়া হইত। বোলশেভিকদের নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে অ-দলীয় বিপ্লবীদের আকুল আবেদন, রাশিয়া হইতে প্রত্যাগত আমার বিশ্বাসভাজন বন্ধুদের নিকট শোনা অত্যাচারের কাহিনী এবং সর্বোপরি গর্কির চিঠিগুলি আমার বিদ্রোহকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। গর্কি তখন সদ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়িয়া আসিয়াছেন এবং তিক্ত বিষণ্ণ নৈরাশ্যে তাহার মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছে। মনের স্বাধীনতা আরও বেশি করিয়া আমার রণপতাকা হইয়া উঠিল। তথাপি ইহা যাহাতে আমার সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অজুহাত হইয়া উঠিতে না পারে, সে-বিষয়ে আমি সতর্ক থাকিলাম। শুধু সতর্ক থাকিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম না, সর্বহারার সংগ্রামের আকাশেই সে-পতাকাকে আমি উড্ডীন দেখিতে চাহিলাম।

তিন বৎসর আগে ই. ডি. মরেলের নিকট লিখিত একটি চিঠিতে বিপ্লবীদের শিবিরে স্থান লইবার জন্য বুদ্ধিজীবীদের আমি আহ্বান জানাইয়াছিলাম। ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয় এবং এই আলোচনা চরমে পৌঁছায় বারবুসের সহিত বিতর্কে। এই প্রসঙ্গে জানাইয়াছিলাম যে, সাহায্যের ইচ্ছা লইয়া যে সকল শ্রেষ্ঠ মনীষী বিপ্লবের দিকে আসিতেছিলেন, তাহাদের মুখের উপর বিপ্লবের দ্বার এইভাবে রুদ্ধ করিলে বিপ্লবেরই ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইবে।

আজ আমি আবার সেই প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাইতে চাই। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্লার্তে পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া বারবুস যে বিরাট বিতর্কের সূত্রপাত করেন তাহাকে আবার ধীর শান্তভাবে বিচার করিতে চাই। ১৯২২ সালের ব্রুসেলসের লা'র লিব্‌র্ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খোলা চিঠিতে তীব্র ভাষায় এই চিঠির আমি জবাব দিই। তখন সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া বাদ-প্রতিবাদের সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল। উভয় পক্ষই সমধর্মী লেখকদের নিকট হইতে সাহায্য ও সমর্থন পাইতে লাগিলেন। সংগ্রাম সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, মুক্তির পথ পাইয়া যে বিক্ষোভ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল তাহা বহুবৎসর ধরিয়া আমাকে ও বারবুসকে আঘাত করিয়া চলিল। কিন্তু ইহাতে আমাদের কাহারও ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। সেদিন হইতে আজ বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই বার বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে আজ মনে হয়, এই বিতর্ক হইতে আমরা উভয়েই লাভবান হইয়াছি। অন্তত আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে পারি, এই লাভ স্বীকারে আমি ভীত বা কুণ্ঠিত নই। আমাদের

দুই মতবাদ ছিল যেন একই মুদ্রার দুইটি বিপরীত পিঠ, প্রত্যেক পিঠেই বিপ্লবের ছাপ।

পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া মতবাদ দুইটি পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল। বারবুসের পূর্বোক্ত যে-প্রবন্ধে ("কর্তব্যের অপরাধ। রলাঁবাদ সম্পর্কে") বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাহাতে তিনি চিন্তার স্বাধীনতার ধ্বজাধারীগণের রাজনীতির প্রতি ঔদাসীন্যকে আক্রমণ করিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন। "কর্তব্যের অপরাধের" কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াও তিনি সত্যপথের ইঙ্গিতই করিয়াছিলেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন, বর্তমানে সমাজব্যবস্থার ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না, নূতন সমাজব্যবস্থার গঠনের কাজেও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করিতে হইবে। অগ্নিপরীক্ষার চরম মুহূর্ত যখন আসে তখন মানুষের এবং রাজনৈতিক মতবাদের আদর্শ-চ্যুতি ও ব্যর্থতাকে ভুলিয়া যাইবার অথবা ক্ষমা করিবার যে-অক্ষমতা আমার মনকে পঙ্গু করিয়াছিল তাহার বিরোধিতা করিয়া বারবুস্ হয় ত' ঠিকই করিয়াছিলেন! সমাজতন্ত্র ১৯১৪ সালের সংকটে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল বলিয়া সমাজতন্ত্রের প্রতি আমার বিশ্বাসের অভাবকেও সমালোচনা করিয়া বারবুস হয় ত' ভুল করেন নাই। কারণ যাহারা প্রবঞ্চিত হইয়াছে এবং প্রবঞ্চিত হওয়ার সত্যটিকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাদের ফিরিয়া আসিবার জন্য দ্বার আমাদের সবসময় খুলিয়া রাখিতে হইবে, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু কোন সে এক "সামাজিক জ্যামিতির" "মৌলিক নিয়মাবলীর নির্ভুলতাকে" মানুষের মনের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। মার্কস-লেনিনপন্থী বিপ্লবটি ত'

একটি সামাজিক পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং যদিও ইহার সাফল্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না তথাপি এ-কথা বলা যায় যে, সামাজিক মুক্তি আনিবার বাস্তব সুযোগ ও সম্ভাবনা একমাত্র এই পথেই আছে। (মানুষের ভাগ্য প্রতিমুহূর্তে উলট্‌পালট্‌ হইতেছে; নিয়তি মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তরিত হইতেছে; মানুষের জীবনে ইহাই ট্র্যাজেডি, আবার ইহাই তাহার মহিমা।) বারবুস ভুল করিয়াছিলেন যে, ভুল করিবে বিপ্লব স্বয়ং যদি সে লক্ষ্যলাভের উপায়কে ছোট করিয়া দেখে। আজ আমি ক্লের্ঁা-বোল-এর সেই নীতি সমর্থন করি। এই নীতির কথাই বারবুসকে লিখিয়াছিলাম:

"লক্ষ্য খাঁটি হইলেই যে যে-কোনো উপায়ে লক্ষ্য লাভ করা নীতি সংগত হইা সত্য নহে। সত্যকার প্রগতির পক্ষে লক্ষ্যবস্তু অপেক্ষা লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায়ই মূল্যবান বেশি। কারণ, লক্ষ্যবস্তু (যাহা কখনও লাভ করা যায় না, এবং লাভ করা গেলেও সম্পূর্ণভাবে যায় না) কেবলমাত্র মানুষের বাহিরের সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। কিন্তু ন্যায় অথবা হিংসার ছন্দে ছন্দিত করিয়া মানুষের মনকে গড়িয়া তোলে লক্ষ্যলাভের উপায়। লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য যদি হিংসার পথই বাছিয়া লওয়া হয় তবে যে-প্রকৃতির গভর্নমেণ্টই হউক না কেন প্রবলের উৎপীড়ন হইতে সে দুর্বলকে কখনও রক্ষা করিতে পারিবে না। তাই নৈতিক নীতিগুলিকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি; এবং আমার মনে হয়, সাধারণ সময় হইতে বিপ্লবের সময় এই প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। কারণ, বিপ্লবের যুগে সবই গলিত অবস্থায় থাকে, তাই জাতির মনের যে-কোনো রূপ পরিবর্তনের ছাঁচ সহজেই অঙ্কিত হইয়া যায়।"

জবাবে বারবুস্ যাহা লিখিলেন তাহার ভাষা কিছুটা দুর্বোধ্য, তাহার ভাব তাহাতে ভাল প্রকাশিত হয় নাই। তিনি বলিতে পারিতেন—ইতিহাসের কোনো কোনো কালে হিংসা বড় বেদনাদায়ক প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়, যখন স্পষ্ট কর্মের আহ্বান আসে, লক্ষ্যলাভের উপায় তখন আর মানসিক বিলাস থাকে না, খুশিমত উহা বাছিয়া লইবার অবসরও থাকে না। গলার কাছে কেহ ছুরি ধরিলে দৃঢ়মুঠিতে সেই ছুরি ধরিয়া হত্যাকারীর দিকে তাহার ফলাটা জোর করিয়া আগাইয়া ধরা যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন—খুন হইতে না চাহিলে ইহা না করিয়া যেমন উপায় নাই, ঐতিহাসিক মুহূর্তে হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করাও এইরূপ। বাঁচিতে হইলে প্রত্যেক জীবের পক্ষে হিংসা অপরিহার্য, এই হিংসা আমার পক্ষে অসহ্য; কিন্তু ইহার চেয়েও অসহ্য হিংসার পক্ষে ওকালতী। যুদ্ধ হইতে সদ্য ফিরিয়া আসা উন্মাদেরা তখনকার দিনে এই ওকালতীই করিত। এবং ইহার কথাই বারবুসের নিকট তৃতীয়পত্রে (এপ্রিল ১৯২২) আমি লিখিয়াছিলাম। এই উন্মাদেরা যুদ্ধের নিকৃষ্টতম শিক্ষাকে বিপ্লবের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিল অথচ বিপ্লবের লক্ষ্য যুদ্ধের নিকৃষ্টতম শিক্ষা হইতে আমাদের মুক্ত করা।

কোনো হিংসাই গর্ব করিবার মত গুণ হইতে পারে না। হইতে পারে বড়জোর একটি কঠোর কর্তব্য, যে-কর্তব্য নির্ভীকভাবে সাধন করিতে হইবে অথচ যাহা লইয়া দম্ভ করা চলিবে না। হিংসা যে সংহারশক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহার সম্পর্কে কোনো দায়িত্বশীল বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনেতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আজ রোমের ড্যুচে মেশিনগানের প্রশংসা করিয়া উহা শিশুদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন। কতবড় নির্বোধ, কতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন তিনি। ভীষণ নিয়তিকে

লইয়া উল্লাসে খেলায় মাতা পৌরুষের পরিচয় নহে। প্রয়োজন হইলে উহাকে বিনাবাক্যে, বিনাদম্ভে তুলিয়া লওয়াই সত্যিকারের পৌরুষ।

আমি একথাও বলি, হিংসা শুধু শরীরের প্রতি নহে, মনের প্রতি হিংসা বলিয়াও একটা জিনিস আছে যাহা আমাদের একটুও কম বিচলিত করে না। ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে বারবুসের জবাবে লিখিত আমার প্রথম খোলা চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই এখানে আবার বলি: "জয়লাভের জন্য জীবনের সর্বোচ্চ নীতিকে বারম্বার তাহারা বলি দিয়াছে, বলি দিয়াছে মানবতাকে, স্বাধীনতাকে এবং সকলের চেয়ে বড়, সত্যকে। মানবতার স্বার্থে বিপ্লবেরই স্বার্থ—এই নীতিকে সর্বদা রক্ষা করিতে হইবে। যে-বিপ্লব এইসবকে উপেক্ষা করে, আজ হোক কাল হোক তাহার পরাজয় হইবেই; এবং এ পরাজয় বাস্তবক্ষেত্রের পরাজয় হইতে আরও সাংঘাতিক, এ-পরাজয়ের অর্থ—নৈতিক অধঃপতন।'

স্বাধীন বুদ্ধিজীবী হিসাবে আমাদের কর্তব্য এই নৈতিক শক্তিগুলিকে রক্ষা করা; প্রয়োজন হইলে এমন কি বিপ্লবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও রক্ষা করা। কারণ বিপ্লবের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ক্লেরাঁবোল পুস্তকে আমি বলিয়াছি, "সবার বিরুদ্ধে একের অর্থই সবার জন্য এক। এই একের কর্তব্য সংগ্রামের উন্মাদনার মধ্যে ধ্বংসের হাত হইতে সর্বমানুষের সম্পদকে রক্ষা করা।"

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমার জবাবে আমি খানিকটা উল্লাসের সঙ্গেই বিপ্লবের শিবিরে আমার স্থান করিয়া লই। এই বিপ্লবের শিবিরে আমার প্রবেশ তাহারা বন্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছিল। আমি বলিলাম: "তোমার সহিত যাহার চিন্তার ও মতের মিল নাই

বিপ্লবের মধ্যে তাহার স্থান নাই, তোমাকে এ-বিধান দিবার অধিকার কে দিল? বিপ্লব কোনো বিশেষ দলের সম্পত্তি নহে। যে-মানুষই বৃহত্তর ও মহত্তর ভবিষ্যতকে কামনা করে—বিপ্লবের শিবিরে সেই স্থান পাইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাহারা বিপ্লবের মধ্যে থাকিতে চাহেন স্বাধীনভাবে।" এইখানে আলোচনার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রমঁ্যা রলাঁ এখন আর নিজের জন্য কথা বলিতেছিলেন না। তাচ্ছিল্য করিয়া যাহাদের রলাঁপন্থী বলা হইত তাহাদের সকলের হইয়াই তিনি কথা কহিলেন। চিন্তার স্বাধীনতাকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখার অধিকার এবং শুধু অধিকার নহে, কর্তব্য বলিয়া যাহারা দাবী করেন, তাহাদের সকলের পক্ষ লইয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কারণ, "যে-চিন্তাধারা কোনো দলের পায়ে আত্মবিক্রয় করিয়া নিজের স্থান পরিত্যাগ করে তাহার কি মূল্য আছে।"

কেবলমাত্র রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ সম্পর্কেই আমার চিঠির শেষাংশে গভীর হতাশার অভিব্যক্তি ছিল। ঐ কয়েকমাস আমার ডায়েরীতে এই হতাশা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়টাতে আমি যেন ভবিষ্যদ্দর্শনের একটা মর্মান্তিক ক্ষমতা লাভ করিলাম। অত্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম মুষ্টিমেয় পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদের যুগ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দেখিলাম স্বার্থপর ঔদাসীন্যের ফলে ফ্রান্সে আসিতেছে চরম সংকটের দিন। ভীষণ ভবিষ্যৎকে এত স্পষ্টভাবে দেখা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে বিশ্বাস আমার শিথিল হইল না; বর্তমানের গণ্ডী ছাড়াইয়া আমাদের কর্মক্ষেত্র আমি প্রসারিত করিয়া চলিলাম। আমাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী প্রকাশ করিতে বারবুস্ আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, উত্তরে দুইটি মূল বিষয় তাহাকে জানাইলাম:

(১) ইউনিয়ন অব্ ডেমোক্রেটিক কণ্ট্রোল সঙ্ঘের বীর বন্ধুগণের মত শাসকশ্রেণীর কার্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করা ও নির্ভীক অভিমত ব্যক্ত করা; ভল্‌তেয়ার ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের তিক্ত বিদ্রূপ ও নিষ্ঠুর সমালোচনার ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া সর্বপ্রকারের কলঙ্ক রটনাকে নির্মমভাবে আঘাত ও আক্রমণ করা। এই দুই ব্যাপারে নিরলসভাবে সমস্ত আত্মিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংগ্রাম চালানো।

(২) অহিংস প্রতিরোধ। (ইহা নূতন, আমার বিশ্বাস ফ্রান্সে সাধারণ আলোচনায় গান্ধীর নাম এই সর্বপ্রথম, আমি তখন গান্ধীর জীবনী লিখিতেছি,) অহিংস প্রতিরোধ বলিতে আমি "প্রতিরোধ-হীনতা" বুঝাইতে চাহি নাই। পরন্তু বলিতে চাহিয়াছিলাম ইহাই চরম প্রতিরোধ, পাপাসক্ত রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করিতে, তাহার ইচ্ছা পূরণ করিয়া চলিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি। কেবলমাত্র আত্মিক বল ও বিবেকনিষ্ঠার সাহায্যে এই অস্ত্র কার্যকরী হইতে পারে, সমাজ-সংগ্রামে এই অস্ত্রের যথোপযুক্ত মূল্য স্বীকার না করিবার জন্য বারবুস্ ও তাহার বন্ধুদের আমি তিরস্কার করি। আমি লিখি, "সমষ্টিগত শক্তি লইয়া তোমরা এতদূর মাতিয়া আছ যে, ব্যক্তিগত বিবেকের উপযুক্ত মূল্য দিতে চাহ না। অবশ্য সমষ্টিগত শক্তির যে ভীষণ আকর্ষণ আছে তাহা কাহারও অপেক্ষা আমি কম জানি না।

আমার মতে যেসকল শক্তি পৃথিবীর রূপান্তর আনে—বিবেকের শক্তি তাহাদের অন্যতম। অতএব, এই শক্তি প্রয়োগের কৌশল বিপ্লবকে শিখিতে হইবে। বিপ্লবের উদ্দেশ্যে আমি এই কথা বলি যে, তোমার শিবিরে আমাদের স্থান দাও, তোমার সংগ্রামে ও সংকটে আমাদের অংশ দাও, কিন্তু তোমার শিবিরে আমরা স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিয়া

বন্ধুর মত থাকিব, যাহা ন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার পক্ষে এবং যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিব তাহার বিপক্ষে স্বাধীনভাবে সংগ্রাম করিবার অধিকার যেন আমাদের থাকে।

জনসাধারণের যাহারা আমার কথা শুনিত তাহাদিগকে এবং লেখক বন্ধুদের যাহারা অন্তত প্রগতিচিন্তার পুরোভাগে আছেন বলিয়া নিজেদের প্রকাশ করিতেন তাহাদের উদ্দেশ্যে আমি এই প্রশ্ন করিলাম :

তাহারা কি বিশ্বাস করেন বর্তমানে প্রত্যেক মননশীল মানুষের কর্তব্য সমগ্র দেহমন লইয়া বিপ্লবের বাহিনীতে যোগদান করা, কিম্বা বিপ্লব যদি ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রয়োজন বুঝিতে না চাহে তবে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও মনের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বিপ্লবের আদর্শের, সমগ্র মানব সমাজের আদর্শের সেবা করিয়া যাওয়া? বিপ্লব যদি এই স্বাধীনতার মূল্য না বোঝে, তবে বুঝিতে হইবে নবজাগরণের প্রেরণার উৎস তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, সে এখন নূতন ধরনের এক প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নহে।

বুদ্ধিজীবীদের সকলেই জবাব দিলেন। ব্রুসেল্‌স'এর লা'র লিব্‌র্‌ পত্রিকার ১৯২২ সালের মার্চ সংখ্যায় তাহাদের বিবৃতিগুলি প্রকাশিত হইল; এপ্রিল সংখ্যায় কয়েকজন জার্মানলেখকের উত্তর বাহির হইল। বেলজিয়মের ডাক বিভাগের কর্তৃপক্ষ জার্মান লেখকদের চিঠিগুলি আটকাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স, জার্মানী ও বেলজিয়মের ২৬ জন বিখ্যাত লেখক ও চিত্রকরের জবাব প্রকাশিত হইল। রেণে আর্কস, জর্জ ব্রাঁদ, লিয়ঁ বাজালজেৎ, জর্জ শেনভিয়ের, পল কলঁ্যা, জর্জ দ্যুআমেল, এদুয়ার দ্যুজার্দ্যাঁ, ল্যুক দ্যুর্তাঁ, গুস্তাভ্‌ দ্যুপ্যাঁ, জঁা দেত্রি, ক্যাজিমির এদ্‌শ্মিদ, ফের্ন্যা গুৎনোয়ার দ্য তুরি, পিয়ের জঁা জুভ, আর্নেৎ কল্‌ব্‌, আন্দ্রেয়াস লাৎস্‌কো, ফ্রানজ

মাসেরেল, হাইনরিখ মান, মার্শেল মার্তিনে, জাক মেনিল, জ্যুল রমঁ্যা, য়েনে শিকেলে, ফ্রিৎস্ ফন উনরুশ, শার্ল ভিলদার্ক, হেন্‌রি ভান ডের ভেল্ডে, লেয়ন ভের্ত, স্তেফান ৎসাইগ, ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন নরম্যান এঞ্জেল, ফ্রেডেরিক ভ্যান এডেন, ডগলাস্ গোল্ডরিং, ই. ডি. মরেল ও বার্ট্রাণ্ড রাসেল। চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে ইহারা আস্থা জ্ঞাপন করিয়া পাঠাইলেন, হান্‌স রিনের একই মত ব্যক্ত করিলেন কিন্তু আলাদাভাবে ১৯২২ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের জুর্নাল দ্যু পেপ্‌ল পত্রিকায়।

এই বিতর্কে অধিকাংশই বিনাশর্তে চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার সকলেই সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন—চিন্তার স্বাধীনতার প্রতি যাহাদের অতিরিক্ত আসক্তি ছিল তাহারা পর্যন্ত করিলেন। নিম্নে ঐ বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্তসার দিতেছি:

মনের স্বাধীনতার ও স্বতন্ত্রতা রক্ষার পক্ষে যাহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে জর্জ দ্যুআমেল ও স্তেফান ৎসাইগই সর্বাগ্রগণ্য, দ্যুআমেলের মতে মননসর্বস্ব মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মযোগীর প্রতি তাহার ছিল নিবিড় তাচ্ছিল্য।

তিনি বলিলেন, "বিপ্লব চিন্তাজগতের ব্যাপার (গ্যালিলিও, নিউটন, বিটোফেন)···রাজনৈতিক বিপ্লব তুচ্ছ ব্যাপার, ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। সমাজবিপ্লব শুরু হইয়াছে হাজার হাজার বছর আগে এবং ইহার কখনও শেষ হইবে না। বারম্বার ইহার বিকাশ হয় মানুষের মনে—রাস্তায় নহে। লা বোয়েসি, ভোবাঁ, রুসো, ভিটারো—ইহারা সকলেই বিপ্লবী ছিলেন। সেণ্ট জাস্ট ছিলেন একজন আন্দোলনকারী মাত্র।"

কর্মের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে এখানে কোনো উপলব্ধি নাই। এই বিপ্লব মানসলোকের বিপ্লব, নিজের সময়মত ইহা আসিবে এবং এক বিপ্লবের পর আর এক বিপ্লব আসিতে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবে। ৎসাইগেরও বিশ্বাস ছিল কোনো দল বা পৃথিবীর স্বাধীনতা অপেক্ষা মনের স্বাধীনতা অনেক বড়, অনেক বেশি প্রয়োজনীয়, দ্যুআমলে অপেক্ষা ৎসাইগ আরও একটু বেশি দূর গিয়াছেন, কেমন একটা পরাজয়ের হতাশা লইয়া তিনি স্বীকার করিতেন যে, যে-আদর্শের জন্য তিনি সংগ্রাম করিতেছেন দৃশ্যমান জগতে তাহা সফলতা লাভ করিবে না। দ্যুআমেলের কিন্তু এ-নৈরাশ্য ছিল না, সমাজসংগ্রামে লেখকের যোগদানের সম্ভাবনাকে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বহির্জগত ও চিন্তাজগতের মধ্যে ৎসাইগের কাছে কোনো সংযোগ ছিল না।

চিন্তার স্বাধীনতার আদর্শে পরিপূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন জ্যুল রমঁ্যা, ফ্রানজ্ মাসেরেল, হাইনরিখ মান, জর্জ শেনভিয়ের, হান্‌স রিনের, রেনে শিকেলে ও ফ্রিৎস ফন উন্‌রুশ। কেবলমাত্র শেষোক্ত ব্যক্তি গান্ধীর কথা বলিয়াছিলেন, "মিথ্যা দেবতার পদতলে মন উৎসর্গ করিতে অস্বীকার করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে তিনি যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন" তাহার উল্লেখও তিনি করেন।

বিরোধী দলে ছিলেন মার্শেল মার্তিনে। তিনি চাহিয়াছিলেন বিপ্লবের আগুনে পরিপূর্ণ আত্মাহুতি; বিপ্লবের দুঃখের, বিপ্লবের ভুলের অংশ গ্রহণ। তাহার এই আহ্বানের মধ্যে ছিল তাহার স্বাভাবিক আবেগউদ্বেল হৃদয়ের নিবিড় কারুণ্য। অন্যদিক হইতে, আরও নিরাশক্ত দিক হইতে দ্যুআমেলের মতই অনেকটা মানস-

লোকের দিক হইতেই বিচার করিয়া এদুয়ার দ্যুজাবৃদ্যাঁ সাদা চেক সই করিয়া বিপ্লবের হাতে তুলিয়া দিতে চাহিলেন। তাহার মননশীলতায় গভীরতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল বলিয়াই ক্যাথলিক স্বৈরতন্ত্রের বিলাসকে (এই স্বৈরতন্ত্র ও বিপ্লব তাহার নিকট একই বস্তু) গ্রহণ করিতে তাহার বাধে নাই; যদিও ধর্মানুশাসনের প্রতি এই অন্ধ আনুগত্যের উপর তিনি বিদ্রোহী অবিশ্বাসীর আভিজাত্যের একটা ছাপ দিয়া লইয়াছিলেন। "জনসাধারণের জন্য নির্মম সমষ্টিগত শৃঙ্খলনিষ্ঠা; আর মুষ্টিমেয়র জন্য স্বাধীনতা—মৃত্যুপথের স্বাধীনতা।"

সমষ্টিজীবনের নীতি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতি এই দুইটিকেই যাহারা রক্ষা করিতে চাহিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন লিয় বাজালজেৎ; ইহার ছিল ওয়াল্ট হুইটম্যানের বাণীর প্রেরণা। আর ছিলেন ল্যুক দুর্ত্যাঁ, স্বাধীন চিন্তাজীবীদের স্থান তিনি নির্দেশ করিয়াছিলেন সাধারণ সৈনিকদিকের পুরোভাগে, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মধ্যে নহে। আর ছিলেন কাজিমির এদ্‌শ্মিদ। বিপ্লবের প্রয়োজনের দিক হইতেই চিন্তার স্বাধীনতার দাবী জানাইয়া তিনি বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ হইতেই বিশেষ অধিকার দাবী করেন যে, বিপ্লব যদি তাহার কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয় তবে বুদ্ধিজীবীরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে। পল কল্যাঁ চাহিলেন, রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে স্বাধীন ব্যক্তিদের সামাজিক কার্যের কর্মসূচী জুড়িয়া দিতে। এই কর্মসূচীর প্রধান দুইটি বিষয় হইবে: শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিকার করা এবং চিন্তাক্ষেত্রে আন্তজাতিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করা।

মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতাকে বহির্জগতের কর্মের মধ্যে রূপদান

করিবার যে-পদ্ধতি গুস্তাভ্ দুপ্যাঁ উত্থাপন করেন প্রায় সকলেই তাহা সমর্থন করেন। আন্দ্রেয়াস লাৎসকো, জাক মেনিল, রেনে আর্কস এই সমর্থনে যোগ দেন। চিন্তার স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমর্থক ভিলদার্ক কিন্তু চিন্তাকে কর্ম হইতে পৃথকের বিরোধী ছিলেন, আজও সেই মতই পোষণ করেন। তিনি সর্বদাই পুরোভাগে রহিয়া গিয়াছেন। কাজ করিতে হইবে, কিন্তু কাজ করিতে হইবে স্বাধীনভাবে! একমাত্র পিয়ের জঁা জুভই "আর্টের বিশেষ উদ্দেশ্যের" কথা তোলেন, এ-ব্যাপারে তিনি স্তেফান ৎসাইগের খুব কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু তাহার আবেগময় প্রকৃতির জন্যই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তিনি আবেগের সহিত সংগ্রাম ঘোষণা করেন।

মোটের উপর বুদ্ধিজীবীদের এই সমাবেশ বিপ্লবের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জ্ঞাপনেরই পরিচায়ক, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার দিকে যাহাদের সবচেয়ে বেশি ঝোঁক তাহারাও ইহার ব্যতিক্রম নহেন। তার উপর আলোচনা চলে একটা প্রশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে, প্রত্যেকেই বিপক্ষের প্রতি মৈত্রী ও সহনশীলতার ভাব লইয়া বিতর্ক চালান, কেবল মাত্র একজন বিতর্ককালে বারবুসের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করেন নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিতর্ক যখন সভাস্থল হইতে পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিস্তৃতিলাভ করিল তখন ভাষার আর সে-সংযম রহিল না। বারবুসের অসাধারণ আত্মসংযমের প্রশংসা আমি চিরদিনই করিয়া আসিয়াছি। সংঘর্ষের একেবারে মধ্যে দাঁড়াইয়া শত্রুর বহু আঘাত গ্রহণ করিয়াও কখনও তিনি তাহার স্থৈর্য হারান নাই। কিন্তু মার্সেল মার্তিনের এতখানি ধৈর্য ছিল না। অধীর আবেগে তিনি রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ১৯২২ সালের ৮ই মার্চ লা আঁতের-নাসিয়নাল পত্রিকায় এবং ২৫শে মার্চের ল্যুমানিতে পত্রিকায়

দুইটি প্রবন্ধে (দি রিভলিউসন এণ্ড লিবার্টি ; ইণ্টলেক্‌চুয়াল্‌স্‌ এণ্ড দি রিভলিউসন) তিনি সংগ্রাম শুরু করেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বিপ্লব উভয়ের জন্যই একসঙ্গে এতখানি উৎকণ্ঠা বোধকরি আর কাহারও ছিল না, এবং এই দুইয়ের মধ্যে যে শোচনীয় সংগ্রামের শুরু হইল তাহাতে তাহার মত এতখানি ব্যথাও বোধকরি কেহ অনুভব করে নাই। কিন্তু যে জ্বরের আগুন তাহার মনে ও মস্তিষ্কে তখন জ্বলিতেছিল তাহার ফলে তিনি বাক্যের সংযম হারাইয়া বসিলেন। লিখিলেন :

"নৈতিক সুচিতা বাঁচাইয়া আমাদের কতটুকু লাভ হইবে ! (সোভিয়েট রাশিয়ায়) যখন এত লোক আমাদের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ও মরিতেছে তখন তুচ্ছ সম্মানের সুচিতাকে বর্জন করিয়া বিপ্লবী দলের সঙ্গে নিজেদের মিশাইয়া দিতে আমাদের কিসের বাধা !…"

বিরুদ্ধবাদীর প্রতি (জুভ, কল্যাঁ, আর্কস, দুরত্যাঁ) তাহার আঘাত অনেক সময় সম্মান ও শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া গেল ; বুদ্ধিজীবীর বক্তব্যকে তিনি "শিশুর আহার" বলিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত উড়াইয়া দিলেন, স্বাতন্ত্র্যরক্ষাকে বলিলেন, "প্রবঞ্চকের আত্মগোপন।" আদর্শনিষ্ঠ আন্তরিক মহাপ্রাণকে নিজের চারিপাশে টানিয়া আনিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ ভৎর্সনায় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অথচ এই সকল ব্যক্তিরই বিপ্লবের কার্যে আত্মনিয়োগ করিবার আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। তিনি লিখিলেন, "বুদ্ধিজীবীরা সর্বত্র সর্বদা যাহা করিয়া আসিয়াছে আজও তাহাই করিতেছে—তাহারা আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছে। পরে আসার থেকে এখন আসাই ভাল, নচেৎ তাহারা ধ্বংস হইয়া যাক।" এই বিতর্কের সূচনা করিয়াছিলেন বারবুস্‌ ; এবং ক্লার্তে পত্রিকায় আমাকে

যে আক্রমণ করা হয় তাহাতে বাধ্য হইয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এই বিতর্কে যোগদান করি। বিতর্কের সূত্রপাত হইতেই আমার ভয় ছিল বিপ্লবের পক্ষে ইহার ফল শুভ হইবে না, (পরে মার্তিনে নিজে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন) কিন্তু মার্তিনে দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। তিনি যেন এই আক্রমণের মধ্যে তীব্র আনন্দ পাইতে লাগিলেন। আক্রান্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার বিদ্রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

লা'র লিব্‌র্ (১৯২২ সালের এপ্রিল) পত্রিকায় একটি শেষ প্রবন্ধে আমি জবাব দিলাম ; জবাবটি তাহার অপেক্ষা বারবুসকেই বেশি লক্ষ্য করিয়া। জবাবটির নাম 'বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবীগণ : কমিউনিস্ট বন্ধুদের প্রতি চিঠি।' বারবুসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আমি জানাইলাম, মার্তিনে নিজে যাহাদের নির্ভীক ও নিষ্ঠাবান বলিয়া জানেন মার্তিনেই যে তাহাদের বক্তব্যকে ক্রুদ্ধ বিদ্রূপে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দিবেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। "রুশ বিপ্লবের পুরুষসিংহ-গণের" উদ্দেশ্যে আমি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিলাম। প্রতিক্রিয়ার অপরিমেয় শক্তির বিরুদ্ধে সামান্য সম্বল লইয়া তাহারা যে ভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন তাহা পরম বিস্ময়ের বস্তু! আমাদের মধ্যে এমন কে ছিল যে সহিষ্ণুতার অভাব, ভুল ও হিংসাত্মক কার্যের জন্য তাহাদের তিরস্কার করিতে পারে? "আমরা শুধু এইটুকু বলি যে, ভুলকে ভিত্তি করিয়া কোনো ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে পারে না, দুর্ঘটনা গর্বের বস্তু হইতে পারে না, আত্মরক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে যাহার মধ্য দিয়া হিংসাত্মক নীতি উদ্ভূত হইয়া আসিবে।" চিন্তার স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার উত্থাপন করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, এই আদিম প্রবৃত্তির সহিত, মনুষ্যপ্রকৃতির এই মৌলিকশক্তির সহিত সংগ্রামে মত্ত হওয়া বিপ্লবের পক্ষে সবচেয়ে

মারাত্মক ভুল হইবে। "সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের ন্যায্য দাবীর সহিত আত্মার স্বাধীনতার সমান ন্যায্য দাবীর সমন্বয় সাধনই আমাদের বর্তমান সমস্যা।" অর্থনৈতিক বস্তুবাদ যে একদল বিপ্লবীর মনের পরিধিকে ছোট করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাকে আমি আক্রমণ করিলাম। "মন প্রকৃতির একটি শক্তি। ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগত। ইহা ইহার নিজের নিয়ম মানিয়া চলে। একই লক্ষ্যগামী বিভিন্ন শক্তির বাধাহীন স্ফুরণের মধ্য দিয়াই বিপ্লবে ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারিত হইবে।"

কর্মরত বিপ্লবীগণের অসহিষ্ণু সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করিয়া আমি যদি ভুল না করিয়া থাকি তবে তাহাদের কর্মের দিক হইতে দেখিয়া আমার এই অস্পষ্ট পথনির্দেশকে তাহারা যদি মুল্যহীন বলিয়া ধিক্কৃত করিত তবে তাহারাও ভুল করিত না। ভাবসর্বস্ব আদর্শবাদের ইহাই দোষ। কর্মক্ষেত্রের সীমান্তরেখাটির উপর যুগ যুগ ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অভ্যস্ত অথচ বাস্তবের সহিত মুখোমুখি হয় নাই এমন যে আদর্শবাদ তাহা ত' অস্পষ্ট ও অবাস্তব হইবেই। নীতিজ্ঞানহীন জুয়াড়ীর হাতে পড়িয়া যখন ইহা ভাববাদের বড় বড় কয়েকটি কথার জালে জড়াইয়া পড়ে তখন তাহা যে কোন কাজে লাগে একমাত্র ভগবানই তাহা বলিতে পারেন। 'মন' অথবা 'চিন্তা' এই দুইটি কথা হইতে যে কত বিপদের সৃষ্টি হইতে পারে তাহা আমি পরে বুঝিয়াছি। কারণ, নিম্নমধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের কপট স্বার্থপরতা অতি সহজে এই দুইটি কথাকে কাজে লাগাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন সম্পত্তি রক্ষা হয়, অপর দিকে তেমনি প্রতিক্রিয়ার সহায়তায় ও সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থহানি করিয়া নিজেদের সুযোগ সুবিধাও বাড়াইয়া লওয়া যায়।

মন যে প্রকৃতির শক্তি এ-কথা ঠিক। কিন্তু অন্যান্য শক্তির মধ্যে ইহার স্থান খুঁজিয়া লইতে হইবে। এই সকল শক্তির প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ অনুসারে বিপ্লব তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে নূতন জগত সৃষ্টির জন্য কর্তব্যে ও অধিকারে। সেদিন হইতে আজ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছি যে সর্বহারা বিপ্লবের সহিত সামাজিক কর্মের একাত্মতা সৃষ্টি মনের কর্তব্য। কারণ, ইহা নিজের অগ্রগতির এমন পথ সৃষ্টি করিতে করিতে যায় যাহা কাণাগলির মধ্যে হঠাৎ শেষ হইয়া যায় না। তাই যদি হয় তবে আমি বলিব গৃহযুদ্ধের যন্ত্রণাজঠর হইতে বিজয়ী হইয়া বাহিরে আসিয়া স্টালিনের দৃঢ় অথচ কমনীয় হস্তের পরিচালনায় বিপ্লব স্বাধীন চিন্তার অধিকারকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছে।

'এক' ও 'সমস্ত'—এই দুই বিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন ম্যাক্সিম গর্কি। সোভিয়েটভূমির সাহিত্যিক গণতন্ত্রের সমস্ত বিরোধ বিতর্কের মহান বিচারক ইনি, কোনো সরকারী খেতাব ইহার নাই, কেবলমাত্র নিজের প্রতিভাবলে এবং সর্বস্বীকৃত অনুশাসনের ক্ষমতা বলে ইনি সোভিয়েট ইউনিয়নের মনন জগতকে প্রেরণা দেন, ধিক্কার দেন, শাসন করেন, পরিচালনা করেন। আজ রাশিয়ায় তাহারই চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছে বৃহত্তর, ব্যাপকতর, বলিষ্ঠতর এমন একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যাহা সমষ্টিজীবনের সহিত সহজেই মিশিয়া যায়, মিশিয়া গিয়া তাহাকে উন্নত করে ও নিজে উন্নত হয়, পৃথিবীতে কোন যুগে কোন দেশে কে কবে দেখিয়াছে সমাজের মহান সেবক হিসাবে ব্যক্তিবিশেষের মহিমা এতখানি সমারোহে সমাদৃত হয়। চিন্তার ও কর্মের জন্য সমগ্র মনুষ্যসমাজের যাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তাহাদের নামে নগরের নামকরণ কবে কোন রাষ্ট্র করিয়াছে?

কিন্তু আমি যখনকার কথা বলিতেছি (১৯২২ সাল) তখন অসহিষ্ণুতা ছিল সকলেরই মনে, যুদ্ধ অবসান হইবার সময় যে-ভয় আমি করিয়াছিলাম অর্থাৎ বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গভীর ভেদরেখা সৃষ্টি হইবে, সে ভয় আমার সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। বিপ্লবের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া স্বাধীন চিন্তার অধিকার দাবী আমারা একা করি নাই, যে বলি বিপ্লব আমাদের নিকট চাহিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমরা একা জানাই নাই; বিপ্লবের মধ্য হইতেই অর্থাৎ একনায়কত্বের আদর্শে উন্মাদ বিপ্লবীদের মধ্য হইতে বিজ্ঞতর বিপ্লবের নিকট আবেদন আমরা একা করি নাই। বিজ্ঞতর বিপ্লব বলিতে সেই বিপ্লবকেই বুঝি যে-বিপ্লব ইহার বিভিন্ন বিভাগকে সাজাইতে জানে, আর জানে কেমন করিয়া সমগ্রের সহিত স্বাধীন স্বতন্ত্র নানা বৈচিত্র্যের অংশগুলিকে সংযোগ করিতে হয়।

বারবুসের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যকে স্বয়ং গর্কি সমর্থন করিয়াছিলেন, আমাদের দুইজনেই তখন গভীর নৈরাশ্যভারে আচ্ছন্ন, অবশ্য তারপর দুইজনই চেষ্টা করিয়া এই নৈরাশ্য কাটাইয়া উঠিয়াছি। নিজ নিজ দেশে সংগ্রামের ব্যর্থতা হইতে আমাদের মনে এই নৈরাশ্যের জন্ম হয়। শুধু নিজের উপর নহে, রাশিয়ার উপরও যাহাতে আরও বেশি নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন, রাশিয়ার ভাগ্যকে যাহাতে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন এবং নিজের ভাগ্যকে উহার সহিত মিশাইয়া দিতে পারেন সেই জন্য যখন কিছুদিনের মত গর্কি রাশিয়া হইতে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করিলেন ঠিক তখন আমিও ফ্রান্স পরিত্যাগ করিলাম। আমি দেখিলাম অন্ধ অবাধ্য ফ্রান্স নূতন যুদ্ধ ও প্রতিক্রিয়ার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে; সংঘাত সমাসন্ন, অথচ তাহার গতিরোধ করিবার

কোনো সম্ভাবনাই নাই। ১৯২২ সালের ৩০শে এপ্রিল আমি চিরদিনের মত পারী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সুইজারল্যাণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করিলাম।

৪

পর্বতমালার গভীরে অরণ্যপ্রান্তরের কোলে নিবিড় নির্জনতার মধ্যে মনকে বিভ্রান্ত করিবার মত কিছু ছিল না। আমার অশান্ত আত্মার জন্য কর্তব্যপথের অনুসন্ধানে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম। আমার এ-আত্মা ইউরোপের আত্মা, পৃথিবীর আত্মা; মনুষ্যসমাজের একটি সমগ্র যুগের সাংঘাতিক আলোড়নে সে তখন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। সবই ত' আপেক্ষিক, তাই পারী হইতে বিচ্ছেদ আমাকে বহির্জগতের আরও কাছে আনিয়া দিল। 'ভিলেনেভ'এর সাধনাভবনে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এখান হইতে কয়েক মিনিট গেলে সিমপ্লন গিরিবর্ত্মের উপর দিয়া সেই বিরাট আন্তর্জাতিক রাস্তা গিয়াছে, যে-রাস্তা বাহিয়া একদিন অবিশ্রাম গতিতে ইউরোপের রক্ত বহিয়া চলিয়াছিল। লণ্ডন-পারী হইতে ব্রিন্দিসি, ব্রিন্দিসি হইতে ওরিয়েণ্ট; এবং ঐ পথেই ঐ রক্ত আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। এখানে বসিয়া কেবলমাত্র ইউরোপ নহে, ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ দ্বার ছাড়াইয়া এশিয়ার সহিত এ-সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলাম। তখন আমার দৃষ্টির পরিধি ও বন্ধুত্বের সীমানা বাড়িয়া গিয়াছে বিপুলভাবে। একদিকে আসিয়াছে ভারবর্ষ ও জাপান, অন্যদিকে ইবারো—লাতিন আমেরিকা। (অপর আমেরিকার সহিত আমার পরিচয় বহু পূর্ব হইতেই ছিল।)

লেমাস হ্রদের তীরে আসিয়া বাস আরম্ভ করিবার পর কয়েক বৎসর

ধরিয়া আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধী, লাজপত রায়, জওহরলাল নেহরু, ডাঃ আন্‌সারী, স্যার জগদীশচন্দ্র প্রমুখ বর্তমান ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলাম। সুদূর প্রাচ্য এবং বিশেষত জাপানের কয়েকজন তরুণ নেতার সহিতও আমার সহযোগ হইল। কিন্তু এইখানেই আমি থামিলাম না; মেক্সিকো, আর্জেণ্টাইন ও পেরুর জনজীবনও আমার মনকে অধিকার করিল। মেক্সিকোর জনশিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জোসে ভাসকথেলস, লা প্লাটা (আর্জেণ্টাইন) বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও আইনবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক আলফ্রেডো এল প্যালাসিয়স্, পেরুর অত্যাচারী শাসক লেগুইয়া কর্তৃক নির্বাসিত ভিক্তর আর হায়া দেল্লা তোরে—এই সকল আদর্শবাদী কর্মযোগীদের সহিত আমার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। অবিশ্রাম পত্রবিনিময় ত' চলিতে লাগিলই, অধিকন্তু মেক্সিকো, দক্ষিণ আমেরিকা ও জাপানের পত্রিকাগুলিতে আমার বহু প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে লাগিল।

আমার পক্ষে ইহার ফল হইল এই যে প্যান-ইউরোপবাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমার একেবারেই চলিয়া গেল। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যুদ্ধের মধ্যে আমার মানসিক বিবর্তনের একটি স্তর, এ-স্তর এখন আমি স্পষ্টই ছাড়াইয়া আসিলাম। ঠিক এই সময়ে আমার এই পরিত্যক্ত স্তরে স্বভাবত অনুন্নত সেনা বাহিনীর প্রধান অংশ আসিয়া দাঁড়াইল। তরুণ কাউণ্ট কাণ্ডেনহোভে কালোর্গি—তাহার 'প্যান-ইউরোপা' প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাতে যোগ দিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আমি জবাব দিলাম: "না, সময় সরিয়া গিয়াছে···ইউরোপীয় অতি-জাতীয়তাবাদের দিন আর নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে সম্মিলিত করিবার জন্য আমাদের কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এমন কতকগুলি অশুভ

লক্ষণ তখন আমার চোখে পড়িতে শুরু করিয়াছিল যাহার ফলে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে একটা সাংঘাতিক বিরোধের সম্ভাবনায় আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলাম। এতখানি আশঙ্কার কারণ হয় ত' তখনও ছিল না, তথাপি আমার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। এবং এই সম্ভাবনা যাহাতে বাস্তবে পরিণত হইতে না পারে সেইজন্য আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছিলাম। সাধারণ শত্রু বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমি প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বিশ্বসঙ্ঘ গঠনের চেষ্টায় ছিলাম (মার্কিন সাংবাদিক হারমান বার্ণস্টন্-এর চিঠির জবাব, ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৫ সাল এবং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব, ২০শে মে, ১৯২৫ সাল)।

জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে অবশ্য আমি আমার স্বদেশের সংকটের কথা বিস্মৃত হই নাই। রুঢ় অধিকারকে আমি তীব্র-ভাষায় নিন্দা করিলাম (জুলাই, ১৯২৩), এবং ফরাসী ও জার্মানীর মিলন সাধনের জন্য ও জয়ী জাতিগণ কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ফ্রান্সে আমি একটি আন্দোলন চালাইতে লাগিলাম। এই ব্যাপারে সহৃদয়তা, মানবতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি—সবদিক দিয়াই আমার এই আন্দোলন পরিপূর্ণ সমর্থনের যোগ্য। তখন একথা অতি সহজেই বোঝা যাইতেছিল যে যুদ্ধ থামিয়া যাইবার এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত শক্তির সমর্থন অব্যাহত থাকিতে থাকিতেই ফ্রান্স যদি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়া অগ্রসর না হইয়া আসে তবে জার্মানীকে সেই হতাশা ও উন্মাদ হিংসার পথে ঠেলিয়া দিবে। হিটলার ত' আজ এই পথেই তাহাকে আনিয়াছে।

স্পেন, জার্মানী ও অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে-সকল

বুদ্ধিজীবীদের তখন নির্যাতিত, কারারুদ্ধ কিংবা নির্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের উদ্ধারের আন্দোলনেও আমি যোগ দিলাম। কিন্তু শ্রমিক জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধিজীবী কুলীন সম্প্রদায়ের উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ আমি করিলাম না, অথচ আমার লেখকবন্ধুদের অনেকেই মসী-কৌলীন্যের অভিমানে সর্বাগ্রে সেবা ও মনোযোগ দাবী করিতে লাগিলেন। লুই রুজিয়েরের সহিত ইহা লইয়া আমার বিতর্ক হয়; এই বিতর্ক প্রসঙ্গে স্পষ্ট ও তীব্র ভাষায় আমি একথা জানাই যে, বুদ্ধিজীবীর জন্য বিশেষ সম্মান ও সেবা দাবী করার ফলে বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের মধ্যকার যে ব্যবধানপ্রাচীর আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিলাম তাহা আবার খাড়া করা হইবে; দুইটি শ্রেণী পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি যে বিদ্বেষ নিজেদের মধ্যে পুঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল তাহা দূর করিয়া পরস্পরকে সহযোগিতায় সম্মিলিত করিতে চাহিতেছিলাম। ঠিক এমনিভাবেই চাহিতেছিলাম বহির্জগত হইতে ইউরোপের বিপুল বিচ্ছেদকে অর্থাৎ প্যান-ইউরোপকে বিলুপ্ত করিয়া জগতের সমস্ত জাতির শাশ্বত সক্রিয় সহযোগিতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে। (সেদিনের এই বাস্তব সংস্পর্শহীন চমৎকার ভাবাবেগগুলি আজ কত ব্যর্থ ও ভ্রান্তই না মনে হইতেছে।) লুই রুজিয়েরের সহিত আমার যে পত্র বিনিময় হয় তাহা হইতে কতকগুলি অংশ তুলিয়া দিলেই আমার তখনকার দিনের চিন্তাধারা স্পষ্ট হইবে। দার্শনিক লুই রুজিয়ের ছিলেন একজন স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তাবীর। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাহার বিশিষ্ট মতবাদ ছিল। তিনি তখন এমন একটি সঙ্ঘ গঠন করিবার কথা ভাবিতেছিলেন যাহার উদ্দেশ্য হইবে লাতিন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন; কারণ তিনি বলিতে চাহিতেছিলেন লাতিন সংস্কৃতি জগতের

শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। তাহার উপর এই সজ্ঘ সংগ্রাম চালাইবে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য; কারণ রুজিয়েরের মতে "জনসাধারণের সমস্যা অপেক্ষা তাহাদের সমস্যাই আগে বিবেচিত হওয়া উচিত।"

আমার নিকট রুজিয়ের লিখিলেন: "সমস্ত বিষয়টির মূল অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলাম সামাজিক সমস্যাকে নৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করিবার কোনো কারণ নাই, অর্থাৎ সামাজিক সমস্যার সমাধান যে সর্বদাই নীতির দিক দিয়া সন্তোষজনক হইবে তাহার অর্থ নাই। জীবনের মত সমাজও 'ভাল মন্দের উর্ধ্বে'; কিন্তু আমার বিশ্বাস সামাজিক সমস্যা একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা। অর্থাৎ এমন সমাজব্যবস্থা থাকিতে পারে নৈতিক দিক দিয়া বিচার করিলে হয়ত' তাহা পুরাপুরি সন্তোষজনক হইবে না, অথচ সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ কয়েকজনের প্রসাদের পক্ষে যাহা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিবে—কলা, বিজ্ঞান ও মানবতা—যাহাদের বাদ দিয়া জীবনের কোনো অর্থই হয় না তাহাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিবে।" সমাজের এই বাছা কয়েক জনকে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য রুজিয়ের আমাকে তাহার পবিত্র সেনা-দলে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন।

তাহার এই বিশ্বাসের মধ্যে যে একটা মহত্ত্ব ও মহিমা না ছিল তাহা নহে, কিন্তু ইহাতে আভিজাত্যের যে অপরিমেয় দম্ভ ছিল নিজেদের গোষ্ঠীর বাহিরের জীবন সম্পর্কে যে বিপুল উপেক্ষা ছিল তাহা আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই আমি স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিলাম (১৪ই নভেম্বর, ১৯২৪):

"আপনার আন্দোলনের মূল নীতির সহিত আমি একমত হইতে পারি না, ইহার পশ্চাতে এমন একটি সংস্কৃতিগত আদর্শ রহিয়াছে

বলিয়া আমার মনে হয় যাহা সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আপনার সমস্ত চিন্তাধারার পশ্চাতে আমি এমন একজন রোমানকে দেখিতেছি যে রোমের ধ্বংস আসন্ন মনে করিয়া এই ধ্বংসের হাত হইতে রোমকে বাঁচানো ছাড়া আর কোনো কথাই চিন্তা করিতেছে না। আমার নামের মধ্যে রোমান কথাটা থাকিলেও আমি রোমান নহি। লাতিন সভ্যতার সহিত আমার আদর্শকে এক করিয়া দেখিতে আমি রাজি নহি। এমন কি ফ্রান্সেও এই সভ্যতা বহু জাতির মধ্যে একটি মাত্র জাতির নিজস্ব জিনিস।

"একাধিক বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে ফ্রান্স গঠিত। লাতিন জাতি এই সম্মিলিত সংগীতের একটি বিশিষ্ট সুর ছাড়া আর কিছুই নহে। ফ্রান্স যদি আজ রোমান কিম্বা এমন কি ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতায় পরিণত হয় তবে উহার প্রতি কলানুসন্ধিৎসুর কৌতূহল ছাড়া আমার আর কোনো মনোভাব থাকিবে না। আমি এ-কথাও বলিতে চাহি যে ফ্রান্সের দলত্যাগ সত্ত্বেও ইউরোপ যদি জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পূর্ণ ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা না করে তবে ইউরোপের কোনো ব্যাপারে আমি আর নিজেকে জড়িত করিব না। ইউরোপ তখন হইবে আদর্শভ্রষ্ট। ইউরোপ হইতে আরও বৃহৎ আরও জীবন্ত কেহ আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করুক ও তাহার আদর্শ গ্রহণ করুক। গ্রীক লাতিন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। কেবলমাত্র গ্রীক-লাতিনরাই এই শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে। জাতির আভিজাত্যকে আমি স্বীকার করি না, আমি জাত মানি না।

"মননজীবী কুলীন সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কলা, বিজ্ঞান ও মানবতার কারবার যাহারা করেন তাহাদের বিকাশলাভের সুযোগ না থাকিলে

জীবনধারণের কোনো অর্থই থাকে না"—একথা মানিয়া লওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রথম কারণ, বৃহত্তর মানবসমাজের জন্য বাঁচিয়া থাকিবার 'কষ্ট' আজও আমার পক্ষে আনন্দের বস্তু, এবং দ্বিতীয়ত, আমি পূর্বোক্ত কুলীন সম্প্রদায়ের একজন বলিয়াই আমার সম্প্রদায়কে এই স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দিতে আমি নারাজ, যাহা আমাদের অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের প্রিয় তাহা ছাড়া জীবনধারণের কোনো মূল্যই নাই—ইহা মিথ্যা কথা। জীবনধারণের মূল্য হয় ত' আমাদের কাছে নাই, কিন্তু আমরাই ত' সমগ্র মানবসমাজ নহি; যদি আমরা বাঁচিয়া না থাকি তথাপি আমাদের ছাড়াও যাহারা বাঁচিয়া রহে তাহাদের এই বাঁচিবার কারণ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

"আপনি আমাকে সেই যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, যখন বর্বরদের আক্রমণের হাত হইতে 'নিজেদের পবিত্র পৈতৃক সভ্যতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন কেয়েতিউস, সিমাকুস্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।' আমি আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ঠিক ঐ যুগেই, ঐ সময়েই স্যালভিয়েন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'আমাদের অপেক্ষা বর্বরদের অবস্থা ভাল কেন?' আরও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বহু সম্ভ্রান্ত রোমক পরিবারের বংশধরেরা বর্বরদের জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এ-কথাও আপনাকে স্মরণ করিতে বলি যে, যে-সকল রোমকগণ বর্বরদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন থিয়ডোসিয়ার আইনে তাহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিবার বিধান ছিল, তাহা সত্ত্বেও দলে দলে রোমকগণ বর্বরদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

"পাশ্চাত্যের মননজীবীগণ আজ সেই স্মরণীয় দৃষ্টান্তের কথা ভাবিয়া দেখুন। সভ্যতা ও মনস্বীশ্রেণীকে বাঁচাইতে হইলে অবজ্ঞাত জনসাধারণের মনোযোগ তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। আজও

মনস্বীশ্রেণীর বিকাশলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা জনসাধারণের বিকাশ লাভ; জনসাধারণের ভাগ্যের উপর বুদ্ধিজীবীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছে!

"বুদ্ধিজীবী ও জনসাধারণের মধ্যকার ভেদরেখা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এই দুই দলের মিলনের জন্য আমি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছি, লাভ হইয়াছে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর শত্রুতা। যুদ্ধের পর ফ্রান্সে বুদ্ধিজীবীরা যে-ভাবে কৌলীন্যের দম্ভে জনজীবন হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। সংকট আজ সমাসন্ন…'

আমার মনে হয় এই সতর্কবাণী ও বিশ্বাসের ঘোষণা এখানে পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে। আমার তখনকার দিনের মনের অবস্থা এই চিঠিতে যেমন ব্যক্ত হইয়াছে অন্য কোনো রচনায় তাহা হয় নাই। দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের আদর্শ ও সামাজিক শক্তি বিচার করিয়া যতদিন না পর্যন্ত আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া 'বর্বরদের' দলে যোগ দিই, ততদিন পর্যন্ত এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যে আমার দিন কাটে। কারণ, আমি বুঝিয়াছিলাম ইহারাই ভবিষ্যতের সত্যকার অগ্রদূত এবং মানুষের মুক্তি ও পুনরুজ্জীবনের আশা একমাত্র ইহাদের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

৫

যখনকার কথা লিখিতেছি (১৯২২—১৯২৭) তখনও আমার মন সন্দেহের অন্ধকারে ব্যাকুল, প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বুঝিতেছিলাম 'ইউরোপের বুকে ঝড়' আসন্ন। বাতাসে সে-ঝড়ের গন্ধ যেন আমি দুই নাসারন্ধ্র ভরিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলাম। আর এই ঝড়ের হাত হইতে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিলাম,

আমরা নিজের জন্য ততটা নহে যতটা আমার প্রিয়তমদের জন্য আমার ইউরোপের জন্য। ষাট বৎসর বয়সে তখন আমি আমার জীবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, নিজের জন্য ভয় আমার খুব বেশি ছিল না।

এই সময় আমার চোখে পড়িল ভারতের বুক আলোড়িত করিয়া শীর্ণ অথচ অনমনীয় এক মহাত্মা আত্মিক বলের ঝড় তুলিয়াছেন। ইউরোপের বুকে এই আলোড়ন তুলিবার জন্য আমি সংগ্রাম শুরু করিলাম। মহাত্মা গান্ধী যে 'নীরব ক্ষুদ্র কণ্ঠস্বরের' শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছিলেন আমার ক্লেরাঁবোল পুস্তকে আমিও সেই শক্তির কথা লিখিয়াছি। নিজের জীবনের মধ্য দিয়া তিনি এই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া সমগ্র জাতিকে নিজের অনুগামী করিয়াছিলেন।

গান্ধীর আদর্শ তখন আমার মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; তার সম্বন্ধে যে ছোট বইখানি লিখি ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই যে মাসে লণ্ডনে সি. এফ. এণ্ড্রুজের সহিত আমার পরিচয় হয়; এবং ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে ডব্লিউ-ডব্লিউ পিয়ার্সনের সহিতও আমার পরিচয় হয়। সাউথ আফ্রিকায় গান্ধীজীর ঐতিহাসিক সংগ্রামে ইহারা ছিলেন তার দুইজন সহকর্মী। আমার সহিত দেখা হইবার কিছুদিন পরেই শোচনীয়ভাবে পিয়ার্সনের জীবনাবসান হয়। ইহাদের দেখিয়া আমার যীশু খ্রীষ্টের প্রথম প্রচারকদের কথা মনে পড়ে। সেই বলিষ্ঠ সহজ প্রশান্তি ইহাদের মধ্যে আমি দেখিতে পাই। এই সময় একজন মহিলা আমার সহিত দেখা করিতে আসেন, ইহার নাম মিস্ ম্যাডেলা ইন্স্লেড্, ইনি একজন ইংরেজ এডমিরালের কন্যা। না জানিয়া যে গুরুকে তিনি খুঁজিয়া

বেড়াইতেছিলেন তাহার সন্ধান আমি তাহাকে বলিয়া দিই। ইনিই পরবর্তীকালে গান্ধীজীর মার্থা ও মেরী হন।”

রবীন্দ্রনাথ ও স্যার জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব, কালীদাস নাগ ও লাজপত রায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, ভারতবর্ষের সহিত প্রচুর পত্রবিনিময় এবং বাংলা দেশের পত্রিকাগুলি পাঠ করিবার ফলে আমি ভারতীয় মনে আরও গভীরভাবে প্রবেশ করিলাম। সে-মনের সহিত আমার মনের কোনো কোনো বিষয়ে গভীর সাদৃশ্য দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার ভাবজগতের এমন অনেক রহস্যলোক ছিল যাহাদের এতদিন ভাবিয়া আসিয়াছি কেবলমাত্র ফরাসী চিন্তাজগতেরই জিনিস; সেদিন দেখিলাম ভারতবর্ষেও উহার দোসর মেলে। পরে আমার রামকৃষ্ণের জীবন চরিতের ভূমিকায় আমি এই আবিষ্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি। অবশেষে জেল হইতে বাহিরে আসিয়া ১৯২৪ সালের ২২শে মার্চ তারিখে গান্ধী আমার নিকট যে প্রথম পত্র লেখেন তাহাই আমাদের বন্ধুত্বের পূর্ব সূচনা। মারাত্মক ব্যাধি হইতে উঠিয়া তিনি তখন আরোগ্যের পথে। তখন হইতে কয়েক বৎসর আমি ইউরোপে গান্ধীর ভাবাদর্শের মুখপাত্র হইলাম। গান্ধীর প্রবন্ধ সংকলন ইয়ং ইণ্ডিয়ার (জুলাই, ১৯২৪) ফরাসী সংস্করণের যে ভূমিকা আমি লিখিয়া দিই তাহার মধ্য দিয়া ইউরোপের সমাজসংগ্রামের সহিত গান্ধীজীর ভাবাদর্শকে সহযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যেও রুশ বিপ্লবের আদর্শকে এবং সংগ্রামে নিমগ্ন থাকিয়াও নূতন জগত সৃষ্টির এই অতিমানবীয় প্রচেষ্টাকে আমি কখনও দ্বিতীয় আসন দিই নাই। ভারতের সহিত মস্কোর, আগুনের সহিত জলের মিলন সাধনের আপাত বিপরীত কাজে আমি আত্ম-নিয়োগ করিলাম। ইয়ং ইণ্ডিয়ার ভূমিকাতেও আমি লিখিলাম:

"আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও বিপ্লবীদের হিংসার মধ্যে দূরত্ব ততটা নহে যতটা বীরের মত অহিংস প্রতিরোধ এবং চিরন্তন যো-হুকুম-দারের কৃতদাসসুলভ মনোভাবের মধ্যে। এই মনোভাবই প্রত্যেক অত্যাচারী শাসকের দুর্গস্তম্ভ রচনা করে, সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াকে কায়েমী করিয়া রাখে।"

গান্ধীর আদর্শকে কেহ যে কাপুরুষ ক্লীবের শান্তিবাদিতার সহিত এক করিয়া দেখিবে ইহা আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতাম না। আমি সর্বদা তাহার 'সংগ্রামশীলতার' উপর জোর দিতাম, জোর দিতাম গান্ধীজী কর্তৃক বারম্বার 'তরবারি' কথাটি ব্যবহারের উপর। ইহা তাহার মতে ইস্পাতের তরবারি নয়, তরবারির বিরুদ্ধে তরবারির প্রয়োগ নয়। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সত্যের জন্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আত্মদানের মহান অস্ত্র হিসাবেই গান্ধী 'তরবারি' কথাটি ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্বে জঁা ক্রিস্তফ পুস্তকের শেষে ফ্রান্স ও জার্মানীকে মিলিত হইবার আহ্বান জানাইয়া লিখিয়াছিলাম, "তাহারা যেন পাশ্চাত্যের দুইটি ডানা। একটি ভাঙ্গিয়া গেলে আরেকটিও অচল হইয়া পড়িবে।" ঠিক তেমনইভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগ্রামশীল সাম্যবাদ এবং গান্ধীর নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত অহিংস অবাধ্যতা (আইন অমান্য আন্দোলন) একই বিপ্লবের দুইটি বিরাট ডানা হিসাবেই আমি দেখিতে চাহিয়াছিলাম। আমি চাহিয়াছিলাম ডানা দুইটি যেন পরস্পরের সহিত সহযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে পারে। এ প্রচেষ্টা আমার ব্যর্থ হইয়াছে এবং এ ব্যর্থতায় আমি বিস্মিত হই নাই। এ ব্যর্থতা ছিল অবশ্যম্ভাবী, কারণ যে দুইটি মতবাদকে আমি মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারা আপোস জানিত না,

প্রত্যেকটিই নিজেকে সত্যের একমাত্র ধারক ও বাহক হিসাবে মনে করিত এবং অপর মতবাদের মধ্যকার সত্যকে শত্রু বিবেচনা করিত। আমি কিন্তু একটি বিশেষ মতবাদ দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়াও ছিলাম একজন ইউরোপীয় অবিশ্বাসী। আমাদের অঞ্চলে একটা সাধারণ প্রবচন আছে, "যে সন্দেহ করে সে কখনও মরে না"। কাঁচা ফলের আস্বাদের মত যেমন কষায় তেমনি চমৎকার এই কথাটি। কোনো শক্তিশালী সামাজিক বা ধর্মগত মতবাদকে আমি কোনো-দিন অন্ধ বিশ্বাসের অচলায়তন হিসাবে দেখি নাই, দেখিয়াছি মানুষের অগ্রগতির পথনির্দেশকারী মৌলিক বিধান হিসাবে। গান্ধী-পন্থী ভারতবর্ষের ও সোভিয়েট ইউনিয়নের দুইটি মতবাদ ছিল আমার কাছে দুইটি পরীক্ষা, দুইটি বৃহত্তম, প্রবলতম পরীক্ষা —যে দুইটি পরীক্ষা আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে মানুষের পৃথিবীকে টানিয়া আনিতে পারে। গান্ধী নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি ইহাও ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম এই দুই মতবাদের শক্তি ধ্বংসের হাত হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার পক্ষে খুব বেশি হইবে না। অতএব, পরস্পরকে ধ্বংস না করিয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহারা কি সম্মিলিত হইতে পারিত না? এই মিলনের চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এই চেষ্টা করিয়াছিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত নই।

গান্ধী সম্পর্কিত পুস্তকখানির রচনা যখন আমার কেবল শেষ হইয়াছে তখন লেনিনের মৃত্যু (১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী) গভীর শোক ও সম্ভ্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি দুইটি শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাইলাম ইজভেস্তিয়া পত্রিকায়। একটি টেলিগ্রাম করিয়া, অপরটি চিঠিতে। বোলশেভিক-

দের বিরুদ্ধে সোস্তাল-রিভলিউশনারীদের পক্ষ লইয়া ইতিপূর্বে একাধিকবার আমি লড়িয়াছি (বিশেষত "রুশ বিপ্লবের পিতামহী" ক্যাথারিন ব্রেস্কোভ্‌স্কায়ার নিকট হইতে একটি আবেদন পাইবার পর), এই ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রামের ফল যে কত শোচনীয় হইতে পারে ইতিপূর্বে একাধিকবার তাহাও জানাইয়াছি। তারপর ১৯২৫ সালে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ায় 'হোয়াইট'দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমি যোগ দিই সেকুর রুজ অ্যাতেরনাসিয়নাল-এর সহিত ! এ-প্রতিবাদ 'সমস্ত অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সমস্ত অত্যাচারিতদের পক্ষ সমর্থন।' ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এস. আর. আই-র সেক্রেটারীর জন্য আমি ঐ স্লোগানটি লিখিয়া পাঠাই।

চিন্তার ও সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই ছিল এই অভিযানের মূল কর্তব্য। মস্কোর স্টেট একাডেমী অব সায়েন্স হইতে প্রেরিত একটি ভাষণের দীর্ঘ জবাবে আমি এই কর্তব্যেরই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করি :

"সত্যকার বিপ্লবী মনোবৃত্তি বলিতে আমি তাহাকেই বুঝি যাহা জীবনের বিভিন্ন রূপকে জমাট বাঁধিতে দেয় না অথবা এই সব রূপের মধ্যে জীবনের ধারাস্রোতকে রুদ্ধ হইতে দেয় না। সত্যকার বিপ্লবী মনোবৃত্তি কখনও সামাজিক মিথ্যাচারকে সহ্য করে না। যে সমাজ ধ্বংস করিয়া সে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই সমাজেরই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সমাজ যে অন্ধ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে তাহার বিরুদ্ধে এই বিপ্লবী মনোবৃত্তির সংগ্রাম চলে চিরদিন। যেমন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার যুদ্ধ তেমনই শ্রমিকবিপ্লবের নূতন সংস্কারের বিরুদ্ধেও সে অস্ত্র ধারণ করে। কোনো কিছুকেই ইহা পরম পবিত্রজ্ঞানে অন্ধভাবে গ্রহণ করে না। প্রত্যেক

সামাজিক ও রাজনৈতিক রূপই ইহার চোখে চিরন্তনের বুকে একটি সাময়িক রেখা মাত্র। এই বিপ্লবী মনোবৃত্তি হইতে যে আর্টের জন্ম তাহার কাজ সর্বপ্রকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। পূর্ণ সত্য···। এই পূর্ণ সত্য লাভ করিবার পথে বহুবার আমাদের শ্রমিক বিপ্লবীদের সাথী হইতে হয়। কিন্তু আমরা স্বাধীন সাথী। আমরা খাতায় নাম লিখাই না। আমরা একটি শ্রেণীর প্রভুত্বলাভের জন্য সংগ্রাম করি না, আমাদের সংগ্রাম সর্বমানবের জন্য। কোনো শ্রেণী শাসন করিবে অথবা শাসিত হইবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না···"

বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কথাগুলি সত্য (বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য কথা বলা কত সহজ)। কিন্তু বাস্তবের সহিত ইহার মিল নাই। প্রথমত, শ্রমিকবিপ্লব কোনো একটি শ্রেণীর প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম করে না, সে সংগ্রাম করে সকলের জন্য। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই সে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রেণীসংগ্রামের এই প্রকৃতি দেখিয়া লোকে ভুলিয়া যায় যে, সমস্ত শ্রেণীবিভেদকে বিলুপ্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য, ন্যায় সাম্যের ভিত্তিতে রচিত মানবসমাজই ইহার লক্ষ্য। এই সংগ্রামে যাহারা তখন উন্মত্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহারা ইউরোপে দূর হইতে যেসকল বিপ্লবী এই সংগ্রাম দেখিতেছিলেন তাহারা আরও বেশি ভুল করিয়া সংঘর্ষের (সাময়িক) হিংসার দিকটার উপর একান্তভাবে জোর দিয়াছেন এবং এই ভ্রান্ত ধারণা গড়িয়া উঠিতে দিয়াছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই বিপ্লবের লক্ষ্য অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি বেদনাদায়ক অথচ অপরিহার্য স্তর মাত্র।

অথচ বিপ্লবের মধ্যে স্বাধীনতার কথা বলিতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু এ-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিবে কে? বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব

ইহা দিতে পারে না। সংগ্রামে নামিয়া ইহার একমাত্র কাজ জয়লাভ করা। একমাত্র কঠোর শৃঙ্খলা দ্বারাই ইহা সম্ভব। এমন কোনো সেনাবাহিনী কে কবে দেখিয়াছে যেখানে প্রত্যেক সৈনিক খুশিমত গুলী ছুড়িতে পারে? যাহারা এই ধরনের যোদ্ধা হইতে চাহে তাহাদের নিজের জীবন সংশয় করিয়া এই কাজে নামিতে হইবে। দুইপক্ষ হইতেই তাহাদের দিকে গুলী আসিবার ভয় আছে অথচ ইহাতে কোনো পক্ষেরই সুবিধা হয় না, মনের স্বাধীনতার আদর্শেরও কোনো সুরাহা হয় না।

স্বাধীনতার আদর্শের সম্মান রক্ষার জন্যও যদি তাহারা গুলী বুক পাতিয়া লইতে রাজি থাকিত! এই 'স্বাধীন মনস্বী' ও 'স্বাতন্ত্র্যবাদীদের' এই কয়বছর এত বড় করিয়া দেখিয়া যে-ভুল করিয়াছিলাম সে-ভুল আমার এবার ভাঙ্গিল গভীর আশাভঙ্গের মধ্যে। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিতেই এই মনস্বীদের অধিকাংশই অন্ধকারে আত্মগোপন করিলেন এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থার পশ্চাতে আশ্রয় নিলেন। নীরব ও সাবধানী হইয়া থাকিবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া সমাজও তাহাদের ভার গ্রহণ করিল।

যোগ্যং যোগ্যেন যোযয়েৎ। মনের পরিধির মধ্যে মন রহিল স্বাধীন। আবার এই মনের স্বাধীনতার রক্ষাকর্তার বাকি পৃথিবীটাকে শাসন ও শোষণ করিবার স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ রহিল। মনের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল বটে কিন্তু মনের বাহিরে বৃহৎ পৃথিবীর জনগণ, জাতিগণ সম্পর্কে তাহাদের কোনো উৎকণ্ঠাই রহিল না। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবী ত' তাহারা নহে। জীবনের সহিত কেমন করিয়া আপোস করিতে হয় তাহা তাহারা জানে। চাকর হিসাবে তাহারা খুবই চমৎকার।

লা'ম আঁশাঁতে (বিমুগ্ধ আত্মা) পুস্তকের শেষ পর্বের আগের পর্বে আমি আমার তিক্ততা প্রকাশ করিয়াছি। তরুণ মার্কের "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মরু-

ভূমির মধ্যে পথ খুঁজিয়া ফেরার অভিজ্ঞতা” আমার নিজের অভিজ্ঞতা। কিন্তু মার্ক হইতে এক বিষয়ে আমার সুবিধা ছিল বেশি! আমার পশ্চাতে ছিল দুঃখযন্ত্রণাদীর্ণ ষাট বছরের জীবন; আমার চামড়া ছিল শক্ত।

৬

মার্ক ও আনেৎ তখনও পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ১৯২৫ সালের অক্টোবর হইতে ১৯২৬ সালের মে মাসের মধ্যে আমার ‘মাতা ও পুত্র’ পুস্তকের রচনাকাল।

লা’ম আঁশাঁতে পুস্তকের শেষ পর্বকে কার্ল র‍্যাডেক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আগেকার কয়েক পর্বে “আমি আমার নায়িকাকে একটি অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছি।” আর ইহাও লেখেন যে, “কাহিনীটি লইয়া কোন পথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা লেখক নিজে জানিতেন না বলিয়াই গল্পের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে।” ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, ‘মাতা ও পুত্র’ পুস্তকে মূল বক্তব্য হইতেছে যুদ্ধকে অস্বীকার। এই অস্বীকৃতি এখনও আজও পর্যন্ত আমার সমস্ত সামাজিক মতবাদের ভিত্তি। এবং শুধু আমার নহে আমার সোভিয়েট বন্ধুদেরও বটে।

আজ সর্বপ্রকার সামাজিক অগ্রগতির প্রথম ও প্রধান শর্ত হইতেছে যুদ্ধের বিরোধিতা। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে গত দশবৎসর ধরিয়া যে মৈত্রীবন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মূলেও রহিয়াছে এই যুদ্ধবিরোধিতা। এবং এই মৈত্রীবন্ধনের ফলেই ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমস্টার্ডম আন্দোলনের সহায়তায় সোভিয়েট ইউনিয়ন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করে। অতএব এখানে কোনো কাণাগলির প্রশ্ন ছিল না, বরঞ্চ ছিল তাহারা

বিপরীত। কিন্তু সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হইতে একটি বিরতি তখন আসিয়াছিল। বইএর শেষ কয়পাতার মধ্যে আনেৎ ও মার্ক এ-কথা ভালভাবেই বুঝিয়াছিল যে এই বিরতি সাময়িক বিশ্রাম মাত্র। …আত্মোৎসর্গের পালা তখন শেষ হইয়াছে—মার্ক ও আনেৎ জানিত ইহার জন্য তাহাদিগকে মূল্য দিতে হইবে, ১৯১৮ সালের নবেম্বর মাস হইতেই 'মাতের দালেইরস' পুত্রের শোক অগ্রিম বহন করিতে শুরু করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঘাতকের খড়্গ যে কখন কোথায় নামিবে, শত্রু যে কে—তাহা তাহাদের কেহই তখনও দেখিতে পায় নাই। অবিলম্বে স্পষ্টভাবে শত্রুর রূপ চিনিবার অবস্থা তাহাদের ছিল না। তখনও তাহারা বুঝিতে পারে নাই কাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, কাহার সহিত চূড়ান্ত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইতে হইবে। (কারণ, 'মাতা ও পুত্রের' এই পর্যায়ে সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতই শত্রু বলিয়া প্রতিভাত হয়। পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ ভাল লোকেই আজও এই পর্যায়ে রহিয়াছেন। কিন্তু এই শত্রুর রূপ তাহাদের চোখে অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ, এই শত্রুকে তাহারা সর্বত্র দেখিতে পাইতেছেন; এবং যদিও এই শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য তাহারা নির্ভীকভাবে প্রস্তুত হইতেছেন, তথাপি জানেন না আঘাত ঠিক কোথা হইতে আসিবে এবং শত্রু ঠিক কোন রূপ পরিগ্রহ করিবে।)।

তখন (১৯২৫ ও ১৯২৬) ইতালীয় ফ্যাশিজম্-এর কল্যাণে শত্রুর চেহারা আমাদের চোখে পড়িতে শুরু করিয়াছে। ১৯৩৩ সালের ১০ মে পর্যন্ত আমাদের আর দেরি করিতে হইল না, যদিও কার্ল র‍্যাডেক্-এর মতে তখন হইতেই 'মানবতা-ধর্মী' লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাহার মতে ঐ দিনেই জার্মান ফ্যাশিস্টরা তাহাদের বই পোড়াইয়াছে এবং এই দাহকার্যে শ্রমিক

পার্টির বই ও পূর্বোক্ত লেখকদিগের বইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে নাই।

কিন্তু ফ্রান্সে আমরা আমাদের ইতালীয় ভ্রাতৃগণের অপমান ও নির্যাতনকে আরও বেশি অনুভব করিয়াছিলাম, এবং ইহা কার্ল র‍্যাডেক নির্দিষ্ট তারিখ হইতে প্রায় ৮ বৎসর পূর্বে। আমাদের দুইটি জাতির মধ্যকার বন্ধন এত নিবিড় যে, একের উপর আঘাত আসিলে অবশ্য সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া ওঠে। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে গেলে যৌবনে ইতালী আমার মনের অনেকাংশ জুড়িয়া ছিল। আমার মানসজীবনে ও চিন্তা-জগতে, আমার সমস্ত প্রীতিবন্ধনের মধ্যে সে-দেশের আসন এত-খানি বিস্তৃত ছিল যে, তাহার ভাগ্যকে নিজের ভাগ্যের সহিত মিশাইয়া না দেখিবার কোনো উপায় আমার ছিল না। ১৯২৬ সালের ১০ই জুন মাত্তেওত্তিকে যখন হত্যা করা হয় আমি যেন তাহাতে আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করিলাম। ১৯২৬ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে গুপ্তঘাতকের আক্রমণে আমেন্দোলা যখন নিহত হন ক্ষোভে, ক্রোধে আমি তখন অস্থির হইয়া উঠি। এই আমেন্দোলাই ইহার কয়েকমাস পূর্বে তাহার 'লিবের আমিকোরুম' পুস্তকে স্বহস্তে নিজের নাম ও আমার প্রশংসাবাণী লিখিয়া আমার ষষ্ঠিতম জন্মতিথিতে আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। হত্যাকারীকে আন্তরিক অভিশাপ দিয়া, গভীর শোক জানাইয়া ১৯২৬ সালের ২২শে মে আমেন্দোলার পুত্রকে আমি একটি চিঠি পাঠাই; ফ্যাশিস্ট সেন্সরের কবলে পড়িয়া সে-চিঠি সম্ভবত যথাস্থানে পৌছায় নাই। তখন আমি ইতালীর নিপীড়িত যুবকসমাজ ও নির্বাসিতগণের সহিত অনবরত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতাম।

শুধু ইতালীয়দের উপর আঘাত হানিয়াই ইতালীয় ফ্যাশিজম্ ক্ষান্ত হইল না, ইউরোপের বিরুদ্ধেও তাহার আঘাত উদ্যত হইল, মুসোলিনী

যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া হুঙ্কার দিতে লাগিলেন। হিটলার যেমন যুদ্ধের অভিপ্রায় গোপন রাখিয়াছিলেন, মুসোলিনী তাহা করেন নাই। যুদ্ধ ও ফ্যাশিজম্ দুই সহোদর ভাই। যে "সংগ্রামের ঊর্ধ্বে" নীতিকে শেষ অজুহাতরূপে ব্যবহার করিয়া তখনও পর্যন্ত আমরা দূরে সরিয়াছিলাম, এই গুণ্ডার সর্দার তাহাও আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করিতে হয় তবে যুদ্ধের প্ররোচনাকারীদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। ত্রিপোলীতে মুসোলিনী যুদ্ধের আগুন জ্বালিবার যে প্রয়াস দেখাইলেন তাহার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আমি এই যুদ্ধ শুরু করিলাম। ১৯২৬ সালের ১৯ শে এপ্রিল French League of the Rights of Man-এর বাণীতে এবং 'রু দাম্‌রসের' বিচার সম্পর্কে ২৩শে এপ্রিল আঁরি তরেমঁ-র নিকট লিখিত একটি চিঠিতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমার শুরু হইল। এই সকল লেখার মারফৎ ইতালীয় ফ্যাশিজমকে আমি আক্রমণ করিলাম, তাহাদের নেতাকে অভিসম্পাত দিলাম, আগামী যুদ্ধের জন্য তাহাকে দায়ী করিলাম। লিখিলাম, "ইউরোপের রক্তের স্রোত যেন ঘুরিয়া তাহার উপরই আসিয়া পড়ে, এবং তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া মারে।"

এই সময় (১৯২৬ সালের জুন-জুলাই) ইতালী পরিভ্রমণ শেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিলেনেভে আমার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন, তাহার আন্তরিকতা, তাহার বিশ্বস্ততা এবং ইউরোপীয় রাজনীতি ও ইতালীয় ভাষা সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া মুসোলিনী ইতিমধ্যে তাহার কাজ হাসিল করিয়াছে। কারণ, তিনি যখন আমার গৃহে আসিলেন দেখিলেন নানাভাবে তোষামোদ করিয়া পশু তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এই ভারতীয় ঋষি যখন মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন, "হিংসা আমি সহ্য করিতে পারি না; হিংসাকে আমি

ঘৃণা করি," বিন্দুমাত্র দ্বিধা সংকোচ না করিয়া পশুও জবাব দিয়াছিল "আমিও করি।" আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাশিজমের আসল রূপ আমি তাহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্রনীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাহার সংযোগসাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন। যে-ফ্যাশিজম্ তখন তাহার নাম ভাঙ্গাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালীয় বন্ধুগণের নিকট এবং সি. এফ্. এণ্ডরুজের নিকট লিখিত চিঠিতে তিনি তাহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন। ১৯২৬ সালের ১৫ই আগস্টের ইউরোপ পত্রিকায় আমি এই চিঠির কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম; পরে ল্যুমানিতে ও অন্যান্য পত্রিকায়ও সেগুলি প্রকাশিত হইল। ব্যাপারটা আমি এইখানেই থামিতে দিলাম না। বোলোঞার শোচনীয় ঘটনার পর ফ্যাশিজম্ সম্পর্কে আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট চিঠি লিখিতে থাকিলাম (১৯২৬ সালের নবেম্বর)। একটা সামান্য আক্রমণকে ছুতা করিয়া বোলোঞাতে ড্যুচে ১৫ বছরের একটি নিরীহ বালককে জনতার হাতে তুলিয়া দেন; আর ইতালীর সমস্ত শহরগুলি রক্তে লাল হইয়া ওঠে। যে বৃদ্ধ গুপ্তচর গ্যারিবল্ডির নাম কলংকিত করিয়াছিল তাহার গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদও আমি রবীন্দ্রনাথকে জানাই। আমি তাহাকে লিখিলাম (আমার ধারণা হইয়াছিল এই বিতর্কের মধ্যে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছি বলিয়া তিনি খুশি নন):

"আপনার ইতালীয় আমন্ত্রণকারীদিগের প্রতি যে আস্থা আপনার জন্মিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া আপনার মনের শান্তি নষ্ট করিয়াছি বলিয়া বহুবার আমি নিজেকে ভৎর্সনা করিয়াছি। কিন্তু আপনার শান্তি অপেক্ষা আপনার মহিমাকেই রক্ষা করিতে আমি বেশি তৎপর।

দানবেরা যে ইতিহাসে আপনার নাম কলংকিত করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার এই হস্তক্ষেপের ফলে আপনার মনে যদিও কখনও কোনো অস্বস্তি আসিয়া থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে আপনার সতর্ক বিশ্বস্ত অভিভাবকের কাজ করিয়াছি ভবিষ্যতই তাহার সাক্ষ্য দিবে।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেও তখন ইতালীয় ফ্যাশিজমের তৈলাক্ত প্রচারকার্য শুরু হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্যেও আমি এক বাণী প্রেরণ করিলাম (১৯২৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী 'ইণ্ডিয়ান ডেলি মেল'এ প্রকাশিত চিঠি); এবং তাহার পর হইতে আমার এশিয়ার বন্ধুগণের নিকট প্রেরিত বাণীতে এবং সম্প্রতি (১৯৩৩ সালের নবেম্বর) কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট লিখিত এক বাণীতে আমি এক কথাই বলিয়াছি। ইহার অত্যাল্পকাল পরেই (১৯৩৬ সালের নবেম্বর) বারবুস ও আমি ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করিলাম। আমাদের দুইজনের নামে একটি আবেদন আমরা বাহির করিলাম : "ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে স্বাধীন মানুষের আবেদন।" (Committee for the Defence of the Victims of Fascism and the White Terror) এই ইস্তাহারের, ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী সংখ্যা "শহিদ্ জাতিগুলির সাহায্যার্থে" উৎসর্গীকৃত। ১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পারীর সাল-ব্যুলিয়েতে প্রথম বৃহৎ ফ্যাশিজম্-বিরোধী সভার অধিবেশন হয়। এলবার্ট আইন্‌স্টাইন, আঁরি বারবুস ও রমঁ্যা রলাঁ সভাপতিত্ব করেন। League for the Rights of Man-এর সহসভাপতি পল লাঁজভ্যাঁ কার্যকরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যদিও ফ্যাশিজমের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম, তথাপি দলনিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে

কাজ করিবার অধিকার দাবী করিয়া তখন আমি কথার জাল বুনিয়া চলিতেছিলাম। ১৯২৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী বারবুসকে লিখিয়াছিলাম, "যে-হেতু আমি শ্রমিক প্রগতির সেনাবাহিনীর একজন ঠিক সেইহেতু আমি এই বাহিনীর নেতাদের নিকট হইতে অনুকরণ যোগ্য নৈতিক শৃঙ্খলানিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধার দাবী করি।"

বলিলাম বটে "আমি শ্রমিক প্রগতির সেনাবাহিনীর একজন" কিন্তু মুখ ও চোখ বন্ধ করিয়া যাহাতে এই বাহিনীতে যোগ না দি সেই সম্পর্কে আমি সতর্ক থাকিলাম, ইহার ভুলত্রুটি ও হিংস্রতাকে আক্রমণ করিবার অধিকার আমি ছাড়িতে চাহিলাম না।

আমার তখনকার দিনের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের তিক্ততা ছিল। আমরা নিজেদের 'স্বাধীন' (Independents) নাম দিয়াছিলাম। আজ খোলাখুলিভাবে এই কথা আবার বলিতেছি, কারণ কমিউনিস্ট নেতাগণের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান তাহারা পরে এই ভুল স্বীকার করিয়া শুধরাইয়া লইয়াছিলেন। আমাকে না জানাইয়া বই-এ, প্রতিবাদে অথবা আবেদনে আমার নাম কখন তাহারা কিভাবে ব্যবহার করিতেছিল সে-সম্পর্কে আমি তখন সম্পূর্ণ সতর্ক থাকিতাম। ঐগুলিতে আমার ভাব প্রায়ই ধিকৃত হইত। তাহারা এতদূর পর্যন্ত গিয়াছিল যে, সুইজারল্যাণ্ডের নিকট আপত্তিজনক একটি প্রবন্ধের (১৯২৭ সালের মার্চ মাস) দায়িত্ব তাহারা আমার উপর আরোপ করিয়াছিল। আমি এই সুইজারল্যাণ্ডেরই অতিথি ছিলাম এবং এই প্রবন্ধের জন্য সেখান হইতে আমি বহিষ্কৃত হইতে পারিতাম।

একান্ত বর্তমানের কথা ছাড়া এই সকল উন্মাদেরা আর কিছুই ভাবিত না। এই বর্তমানের সহিত ভবিষ্যৎ পরিণামের কোনো

আর সম্পর্ক ছিল না। আমাদের অনুমতি না লইয়াই তাহারা ইহার মধ্যে আমদের টানিয়া আনিল। ভাবিল, আমাদের মধ্যে যাহারা তখনও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল এইভাবে বিপন্ন হইলে তাহারাও চলিয়া আসিবে। নির্বোধ তাহারা বোঝে নাই ইহাতে তাহারা কাছে না আসিয়া একেবারেই দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ, যে স্বাধীন সে সবই সহ্য করিতে পারে, পারে না কেবল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যের সহিত সংযুক্ত হইতে। একদিন যে দলে সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আসিত, জোর করিয়া আনিতে গেলে সে একেবারেই আসিবে না। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের একাধিক ব্যক্তি এইভাবে দূরে সরিয়া গেলেন। প্রত্যেক দলই এই একই পথ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যে-দলকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি, যে-দলের হাতে ন্যায়ের পতাকা, মহত্তর জগতসৃষ্টির জন্য যে-দল সংগ্রাম করিতেছে, সেই দলের মধ্যে যদি এমন কিছু দেখি যাহা শত্রুর মধ্যে দেখিব, তখন আর উহা সহ্য করা কঠিন। ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইহাকেই আমি ক্রুদ্ধভাবে আক্রমণ করি। কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধেও একসঙ্গে সমানে আক্রমণ চালাইয়া যাই। এই সাধারণ শত্রু ছিল সাম্রাজ্যতন্ত্র, বৃহৎ শিল্পের পুঁজিতন্ত্র; ফ্যাশিজম্ তখনও ভ্রূণাবস্থায়। ফ্রান্সে ইহা তখন ধীরে ধীরে সাময়িক আইনের বেড়াজালে প্রতিষ্ঠিত মানুষকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল ('১৯ সালের বসন্তকাল)।

এই ভুল বুঝাবুঝি আরও দীর্ঘকাল চলিত; কিন্তু ইতিমধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের নীতি পরিবর্তিত হইতে শুরু করিয়াছিল ব্যাপকতার দিকে। তাহার উপর, পশ্চিম ইউরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধি আনাতোল লুনাচারস্কির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে এই অবাঞ্ছনীয় কলহের অবসান হইল।

"রাশিয়ায় নির্যাতন" সম্পর্কে লিবেরতের পত্রিকায় যে তদন্ত প্রকাশিত হয় তাহারই জবাবে এই প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করি। ফ্রান্সের এনার্কিস্ট কমিউনিস্টদের এই নামকরা কাগজখানি উহার চিরাচরিত নীতি অনুসারে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তখন জনমত বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সংখ্যাল্প এনার্কিস্টদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট সাম্যবাদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানাইতে গিয়া তাহারা এই অভিযান শুরু করিয়াছিল অথচ তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই যে, সাম্যবাদী আন্দোলন যদি ধ্বংস হইয়া যায় তবে অন্য সমস্ত বৈপ্লবিক দলও সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। বিপদ তখন চরমে উঠিয়াছে, ইংলণ্ড সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিগণকে জঘন্য বর্বরভাবে বিতাড়িত করিয়াছে। তৈল ব্যবসায়ের অধিপতিগণের চক্রান্ত সফল হইয়াছে; মস্কোর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সম্মিলিত হইতে শুরু করিয়াছে। ১৯২৭ সালের ২৮শে মে লিবেরতের কাগজের অভিযানের জবাবে আমি লিখিলাম যে, সোভিয়েট গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যাহাই বক্তব্য থাক না কেন, "ইউরোপে সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, রাশিয়া আজ বিপন্ন, এবং সে যদি একবার ধ্বংস হইয়া যায় তবে কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শৃঙ্খলিত হইবে না—কি সামাজিক, কি ব্যক্তিগত সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। জগত কয়েক যুগ পিছাইয়া পড়িবে। এশিয়ার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইউরোপের ধনিকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দানবীয় যুদ্ধের জালে দিনে দিনে ইউরোপের সমস্ত জাতিগুলি জড়াইয়া পড়িবে। অতএব এই ভ্রাতৃঘাতী আলোচনা আপততঃ স্থগিত থাকুক। রুশ বিপ্লবের মত এত শক্তিশালী ও

এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমান ইউরোপে আর হয় নাই! ইহার সাহায্যার্থে আসুন আমরা দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাই; শত্রু দ্বারে সমাগত, সাম্রাজ্যে সাম্রাজ্যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। ইউরোপের স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করিতে হইবে।"

আমার এ-কথাগুলি মস্কোর নজর এড়াইল না, সোভিয়েট বিপ্লব তখন যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছিল সেই কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া কাহার সোভিয়েট-প্রীতি কতখানি খাঁটি ধরা পড়িল। ১৯২৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর লুনাচারস্কী আমার নিকট এক পত্র লিখিলেন; যুদ্ধের মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে তাহার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সেখানে তিনিও ছিলেন আমার মতই নির্বাসিত। আমরা তখন পরস্পরকে বুঝিয়াছিলাম ও শ্রদ্ধা করিতে শুরু করিয়াছিলাম। সোভিয়েট রাশিয়ার এই শিক্ষামন্ত্রিটি নিষ্ঠাবান সাম্যবাদী ছিলেন এবং উদারতা মানবীয়তার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আর্ট ও আর্টিস্টরা তাহার নিকট কতখানি ঋণী তাহা আজ সকলেই জানে; গৃহযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ দুর্দিনে আর্ট ও আর্টিস্টদের তিনি কি-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আজ পুরাতন কাহিনী, কিন্তু আমার বইগুলি তখন রাশিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল তাহার বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন। একবৎসর পূর্বে মস্কোর সংবাদপত্রে তিনি আমাকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু এবার লিবেরতের পত্রিকার অভিযানের বিরুদ্ধে আমার জবাবের সুযোগ লইয়া তিনি তাহার পার্টির পক্ষ হইতে আমার প্রতি মৈত্রী ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন! "বিপ্লব ও সংস্কৃতি" নামে পার্টির যে কাগজখানি তখন তাহারা বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তাহাতে সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি আমাকে অনুরোধ জানাইলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন আমি যাহা পাঠাইব তাহাই ছাপা হইবে, এমনকি "আমাদের মূল নীতির

সহিত পার্থক্য থাকিলেও। লিবেরতের পত্রিকার জবাবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এক মুহূর্তে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচয়দানকারী যে-সকল বুদ্ধিজীবী এখনও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাদের চেয়ে আপনার বুদ্ধি ও দৃষ্টি কত ব্যাপক ও নিরাসক্ত। অবশ্য এ-কথায় যেন আপনি মনে না করেন যে, আপনি যাহা যাহা লিখিয়াছেন সব ব্যাপারেই আমাদের মতৈক্য আছে। তবে আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাসের মূল সুরটি সত্যই গভীর ও মহান।”

যে প্রশংসাবাণী তিনি আমার প্রতি উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই প্রশংসাবাণী আমিও তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিতাম। এই চিঠির সুরে এমন একটা উদার সহনশীলতা ছিল যাহা সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্-দৃষ্টির পরিচায়ক। সোভিয়েট বিপ্লবের নিকট হইতে এতদিন আমি ইহারই আশা করিয়া আসিতেছিলাম। যে-হাত তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন সে-হাত জড়াইয়া ধরিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলাম না; আমি অসংকোচে ঘোষণা করিলাম: সোভিয়েট ইউনিয়ন যাহার জন্য সংগ্রাম করিতেছে তাহাতে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন রহিয়াছে। “আন্তর্জাতিক বণিকস্বার্থের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্রাম প্ররোচনার ফলে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজ যখন সমগ্র জগত জুড়িয়া একটা উদ্ধত জনমত সংহত হইয়া উঠিতেছে তখন স্বাধীন ফরাসী হিসাবে আমার কর্তব্য, যে-প্রবঞ্চক প্রতিক্রিয়াশক্তি সারা ইউরোপের সমস্ত জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং রুশ বিপ্লবের অস্বস্তিকর মশালকে নিবাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহাকে আবার আমি আঘাত হানিতে চাই।”

সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে “যে মতের সংকীর্ণতা ও একনায়কত্বের মনো-

ভাব" আমাকে প্রায়ই পীড়া দিত তাহার সমালোচনা হইতে আমি বিরত হইলাম না। সে সমালোচনা আমি পূর্বের মতই করিয়া চলিলাম বটে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট বিপ্লবের "ঐতিহাসিক প্রয়োজনে" আমার বিশ্বাস আমি পুনরায় ঘোষণা করিলাম এবং "ইহা যে মনুষ্য সমাজের শক্তিশালী অগ্রগামী দল" সে-বিশ্বাসও ঘোষণা করিতে ভুলিলাম না।

এই পত্র বিনিময়, এই স্বীকৃতি ও ঘোষণা ১৯২৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। ঐ সঙ্গে লিবেরতের পত্রিকার জবাবটিও প্রকাশিত হইল। কারণ, এই জবাবটি হইতেই সমস্ত ব্যাপারের সূচনা।

তখন হইতে আমাদের মধ্যকার ব্যবধানের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া গেল। রাকোভস্কি তখনও পারীর সোভিয়েট দূতাবাসে ছিলেন। অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে তৈলব্যবসায়ীগণের করতলগত সংবাদপত্রগুলির উন্মাদ চীৎকার অগ্রাহ্য করিয়া সোভিয়েট গণতন্ত্রের দশম বার্ষিকীতে উপস্থিত হইবার জন্য মস্কো হইতে আমাকে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখে ইহার উত্তরে আমি একটি বাণী প্রেরণ করিলাম। বাণীটির নাম দিলাম "রাশিয়ার ভ্রাতাভগ্নীগণের প্রতি।" এই বাণীতে আমি জানাইলাম "সংগ্রামের" অর্ধস্ফুট প্রারম্ভকাল হইতেই রুশ বিপ্লবের প্রতি আমি আসক্ত। আজ যখন সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ, সমস্ত ফ্যাশিস্টবাদ, সমস্ত যুক্তিহীন অবৈজ্ঞানিক মতবাদ ও সংবাদপত্রের প্রচারকার্য জনমতকে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছে, যখন স্বর্ণস্বার্থের ক্রীড়ণক নিজ নিজদিগের গভর্নমেণ্টগুলিকে এইকার্যে তাহারা ভিড়াইতে পারিয়াছে তখন এই চরম সংকটের দিনে পশ্চিম ইউরোপে আমার যে-সকল লেখক ও মনস্বীদের আমি বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতে পারি তাহাদের পক্ষ হইতে এবং

আমার নিজের পক্ষ হইতে আমি পুনরায় আপনাদের নিকট ভ্রাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিতেছি।

এই ভীষণ প্রসঙ্গে যে আকাঙ্ক্ষা আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্টালিনের দ্বিধাহীন দূরদর্শী নীতির ফলে তাহা আজ পূর্ণ হইয়াছে।

সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সোভিয়েট গণতন্ত্রের "সহযাত্রী" হইতে এবং তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিতে আমি কোনোদিন বিরত হই নাই।

৭

ইহার পরের কয়েক বৎসর (১৯২৮-৩৫) আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটিল না, বরঞ্চ যে-নীতি সেদিন আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম সেই নীতির সত্যতা ঐ সময়ের মধ্যে আরও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হইল। ঐ নীতির ভিত্তিতে ঐ সময়ের যে-কয়খানি ইস্তাহার লিখিয়াছিলাম তাহাতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। অবশ্য এমন কিছু হইল না যাহাতে শত্রু ক্ষান্ত হইতে পারে। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই আমার মধ্যে "সংগ্রামের ঊর্ধ্বে" পুস্তকের গ্রন্থকারকেই দেখিতে লাগিল (ঐ পুস্তকের শিরোনামা ছাড়া অবশ্য তাহারা কিছু পড়ে নাই) তাহারা স্বীকার করিতে চাহিল না যে, গত ১৫ বৎসর আমি সংগ্রামের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছি। সে-যুদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে জাতির বর্বর প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ নহে। সে-যুদ্ধ শোষণকারী দাসব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত এক অভিশপ্ত হত্যা-প্রবণ ও সমাজের বিরুদ্ধে সকল জাতিরই এক পবিত্র সংগ্রাম। গত সাত বৎসরে যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি সেগুলি সম্পর্কে মন্তব্য করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। উহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি কথাই এখানে উল্লেখ করিব। পাঠক যেন সেগুলি নিজেরাই দেখিয়া লন। প্রবন্ধ-

গুলি পড়িলেই যথেষ্ট হইবে, উহার টিকা-টিপ্পনির প্রয়োজন হইবে না। প্রবন্ধগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। একই কাজের উহারা চারিটি বিভিন্ন স্তর মাত্র :

১। সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষা ;

২। আন্তর্জাতিক শান্তি ও তাহার আনুসঙ্গিকগুলিকে রক্ষা করা ;

৩। ইউরোপেই হউক কি উপনিবেশেই হউক ধনতন্ত্রী ও সামরিক-তন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা ; এবং

৪। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে গত কয়েক বৎসর যে সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে পরিচালনা করা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে লিখিত এবং ১৯২৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত "আমার রাশিয়ান ভ্রাতাগণের প্রতি" শীর্ষক আমার অভিভাষণের সমালোচনা করিয়া নির্বাসিত রাশিয়ান লেখক "কনস্টান্টাইন বালমণ্ট ও আইভান বুনিন আমাকে যে চিঠি লেখেন তাহার জবাব" (১৯২৮ সালের ২০শে জানুয়ারী)।

প্রতিক্রিয়াপন্থীদের একটি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আপনার গুপ্ত চক্রান্তগুলিকে শান্তির যে মিথ্যা ছদ্ম আবরণে ঢাকিতে চাহিয়াছিল তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি লিখি :

১৯২৮ সালের ৩০শে অক্টোবর : লিয়ঁ হইতে প্রকাশিত লেফর পত্রিকায় লিখিত চিঠি—"কেলগ চুক্তি ও শান্তির প্রহসন" ;

১৯১৯ সালের অক্টোবর : "শান্তির জন্য ডাকাতি"। প্রধানত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হুগেনবুর্গ, আর্নল্ড রেশবের্গ প্রমুখ ব্যক্তিরা ফ্রাঙ্কো-বেলজিয়ান-পোলিশ-জার্মান প্রতিক্রিয়াশীল ব্লক গঠনের যে চক্রান্ত করিতেছিলেন এই প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধে আমি সতর্ক-

বাণী উচ্চারণ করি (১৯২৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ) ;

১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী "রোমের শিক্ষক সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রেরিত আবেদন।" লেফর পত্রিকায় প্রকাশিত। কণ্ডেনহোভে কালের্গির "প্যান-ইউরোপা" আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার আবেদন এই প্রবন্ধে ছিল।

১৯৩০ সালের ৯ই এপ্রিল : "বাহিরের আক্রমণ হইতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে রক্ষার জন্য আবেদন।" এই প্রবন্ধে আক্রমণ করিয়াছিলাম "ফরাসী রাজনীতিতে বৈদেশিক তৈলব্যবসায়ীগণের উদ্ধত হস্তক্ষেপ, উদ্ধত প্রভাব বিস্তারকে—ঘৃণ্যতম পুঁজিবাদীর স্বার্থ ও রক্তপিপাসু ফ্যাশিজমের সহিত রোম, জেনেভা, জুদিয়ার সকল দেবতার নামে, ধর্মের নামে কপটতার জঘন্য গুপ্ত প্রেম" (১৯৩০ সালের ১৯শে এপ্রিল মঁদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।

১৯৩১ সালের ১লা জানুয়ারী : গাস্তঁ রিয়ঁ-র জবাবে লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ : "ইউরোপ নিজেকে প্রসারিত কর অথবা ধ্বংস হইয়া যাও।"

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের লা নুভ্যেল রেভু মঁদেল পত্রিকার এই প্রবন্ধে আমি বুদ্ধিজীবীগণকে নিশ্চেষ্টতার আশ্রয় হইতে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করি! যে দ্বৈত সংগ্রাম শীঘ্রই শুরু হইবে তাহাতে পক্ষ নির্বাচনের জন্য আমি তাহাদের আহ্বান জানাই। এই দ্বৈত সংগ্রাম বলিতে আমি বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ইউরোপের পুঁজিবাদী ফ্যাশিস্টগণের সম্মিলিত শক্তির সংঘর্ষ ; অন্যদিকে ইউরোপের সহিত বিদ্রোহী এশিয়া ও আফ্রিকার সংগ্রাম। আমার পক্ষ হইতে আমি জানাইতেছিলাম, "যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হয় তবে আক্রমণকারী যেই হউক না কেন, আমার স্থান সোভিয়েটের পার্শ্বে। সানইয়াৎসেন

ও গান্ধীর এশিয়ার বিরুদ্ধে সভ্যতার কপট আচরণে আত্মগোপন করিয়া যাহারা অভিযান শুরু করিবে সেই ইউরোপীয় শোষণ-কারীদের পক্ষ লইয়া আমি কখনই যুদ্ধ করিব না। সেই প্রলয়ঙ্কর বর্বর সংগ্রাম যদি কখনও তুমি আরম্ভ কর তবে, হে ইউরোপ, তোমার বিরুদ্ধে, তোমার উদ্ধত স্বৈরাচার ও উন্মত্ত ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আমি অভিযান শুরু করিতে দ্বিধা বোধ করিব না। ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন, চীন এবং প্রাচ্যের নিপীড়িত শোষিত জাতির পাশে দাঁড়াইয়া আমি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইব।

১৯৩১ সালের ২৯শে জানুয়ারী ভক্স পত্রিকায় লিখিত চিঠি: "পিছু ফিরিবার পথ আমি নিজহাতে নষ্ট করিয়াছি"। এই প্রবন্ধে এই কথা জানাইয়া আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম: "আমার মধ্যে এখন একটি নূতন ইউরোপের অভ্যুদয়কে চোখ মেলিয়া তাহারা দেখুন যাহা তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে।" আমার ফরাসী লেখক বন্ধুদের অনেকে আমার পিছু পিছু সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে আগাইয়া আসিলেন।

১৯৩১ সালের ১০ই মে ও অক্টোবর: "গর্কির প্রতি দুইটি অভিনন্দন বাণী"। "তাঁহারা ও আমরা" নামক গর্কির প্রবন্ধাবলীর বইটির ফরাসী সংস্করণের ভূমিকা হিসাবে দ্বিতীয় অভিনন্দনটি ব্যবহৃত হয়।

১৯৩১ সালের ৬ই এপ্রিল "হে অতীত, বিদায়"। ১৫ই জুন ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিতে আমার এই সময়কার মানসিক বিবর্তনের একটা পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, কারণ, ১৯১৫ সালের যুদ্ধের সূচনাকাল হইতে সেদিন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর ও সংঘর্ষের একটা ছবি আছে। সংগ্রামের উর্ধ্বে পুস্তক হইতে কতদূরে আসিয়াছি এই প্রবন্ধটিতে তাহা বুঝা যায়।

ইহার মধ্যে মধ্যে সোভিয়েট লেখকদের সহিত খোলাখুলি আলোচনা

চলে, সোভিয়েট পত্রিকাগুলিতে উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় (৩১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত গ্ল্যাডকভ ও গেলভিলের নিকট লিখিত চিঠি এবং "স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবীয়তা") এবং ইহার পর হইতে বন্ধুত্বের আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়: বুদ্ধিজীবীগণের কঠোর অভিভাবক গর্কির চিন্তাধারা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা শুরু হয় "সত্য ও মিথ্যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ," "সৃষ্টির চরমমুহূর্তে জনগণের ইচ্ছাশক্তি" সম্পর্কে এবং সেখান হইতে ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হয় তৎসম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনার ফলে আমার চিন্তাজগতে যেটুকু সন্দেহের মেঘ অবশিষ্ট ছিল তাহা অপসারিত হইয়া যায়; ব্যক্তি ও সামাজিক মানুষের মধ্যে যে মিল আমি বহুবৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিলাম এইবার তাহার সন্ধান পাইলাম। এই যে ব্যাপক দৃষ্টি ও জ্ঞান আমি লাভ করিলাম তাহা আমার ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী সহকর্মীদের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলাম। শান্তি-বাদী, অহিংসাপন্থী, মানবতাবাদী এবং মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত অথচ আন্তরিক আদর্শবাদী যাহারা মার্ক্সপন্থী-লেনিনপন্থী বিপ্লবের বাস্তব-আসক্ত সংকীর্ণতায় ভীত হইয়াছিলেন, তাহাদের সকলের মধ্যেই আমার নবলব্ধ জ্ঞানকে প্রচার করিবার চেষ্টা করিলাম। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত চিঠিগুলি লিখি:

১। ভ্যালিন্টিন বুল্লাকভ্‌কে লিখিত চিঠি—অহিংসার মত বীরোচিত হিংসায় আত্মবিসর্জন (১৯২৯ সালের ১১ই এপ্রিল);

২। সের্গে রাডিনকে লিখিত "সাম্যবাদী বস্তুবাদ" (১৯৩১ সালের ১৯শে মার্চ);

৩। এডুয়ার প্রিভাকে লিখিত "বিপ্লব ও অহিংসা" (১৯৩১ সালের ৫ই মে);

International League of Women for Peace & Liberty এবং League for the Fighters for Peace এই দুই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত কয়েকটি বাণীর মধ্যে। এই বাণীগুলির মারফত ঐ দুই প্রতিষ্ঠানকে আমি বিপ্লবের শিবিরে আনিবার চেষ্টা করি। ছয়বৎসর আগে ১৯২৪ সালে প্রফেসর রুজিয়েকে লিখিত চিঠিতে আমি বুদ্ধিজীবীর আদর্শের একটা নমুনা দিয়াছিলাম; ঠিক তেমনি ১৯৩০ সালের পর এউজেন রেলজিস-এর আন্তর্জাতিক প্রশ্নাবলীর (২০শে অক্টোবর, ১৯৩০ সাল) দীর্ঘ জবাবে ছয় বৎসর পরে আমি আবার তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি করিলাম।

এউজেন রেলজিস একজন রুমানীয়ান বুদ্ধিজীবী। তিনি আন্তরিকভাবে শান্তিবাদী ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। তাহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু যে আন্তর্জাতিকতায় তিনি বিশ্বাস করেন আমার মতে তাহা বিপজ্জনক। তাহার এই আন্তর্জাতিকতা ইউরোপেই আবদ্ধ, বাহিরের পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন। তাহার এই ভুলের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই, আমি দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম "যে-ইউরোপীয়বাদ আজ বিভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করিতেছে (প্যান-ইউরোপিয়ান ফেডারেশন ইত্যাদি); তাহা একটি নূতন ও আরও সাংঘাতিক জাতীয়তাবাদের মুখোশমাত্র। কারণ ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া যত হিংস্র লুব্ধ স্বার্থের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া-দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এবং অবশিষ্ট জগতের বিরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জা শুরু করিয়াছে। যে-সঙ্ঘে সমগ্র মানবজাতির প্রবেশাধিকার নাই সে-সঙ্ঘকে আমি স্বীকার করি না···সে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ বিশ্বব্যাপী নহে, তাহা আন্তর্জাতিক নামেরই অযোগ্য।" ওদিকে এউজেন রেলজিস রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের প্রতি বুদ্ধিজীবীদের পুরাতন ঔদাসীন্যতাকেই

বহাল রাখিয়াছিলেন। তাহার পক্ষে অবশ্য এই দূরে সরিয়া থাকার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা অহংকার ছিল না; কিন্তু বুর্জোয়া সমাজের একদল অভিজাত মস্তিষ্কবিলাসী কৌশলে এই আচরণটিকে চালু রাখিতে চাহে কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ইহার সুযোগে তাহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে পারে অথচ শ্রমজীবী জনসাধারণ হইতে দূরে অথবা তাহাদের ঊর্ধ্বে আভিজাত্যের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে। এইভাবে দূরে স্বতন্ত্র হইয়া থাকাটা তাহাদের বেশ ভালো লাগে। শ্রমজীবীসাধারণের মধ্যে মিশিয়া যাইতে ত' তাহারা চাহেই না বরঞ্চ রাজনীতির প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। তাহারা যে-যুদ্ধের গৌরব করে সে-যুদ্ধ রঙ্গমঞ্চের সাজানো যুদ্ধ; সমাজজীবনের রণক্ষেত্র হইতে বহুদূরে এ-যুদ্ধ তাহাদের মস্তিষ্কের খেলা ছাড়া আর কিছুই নহে।

এই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে তাহাদেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। স্বার্থপরের মত জনজীবনের কর্তব্য হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তাজীবীদের এক অদ্ভুত কুলিন সম্প্রদায় তাহারা সৃষ্টি করে। ঘনঘন করতালির মধ্যে জুলিয়াঁ বাঁদা একদিন এই কৌলিন্যের দম্ভই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা বহু প্রবন্ধে এবং লা'ম আঁশাঁতে পুস্তকের বহু স্থানে আমি বলিয়াছি—কখনও যথেষ্ট বলিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি নাই—বাস্তব সংস্পর্শ শূন্য মনস্বিতার এই পুতুল পূজার প্রতি আমার নিবিড় ঘৃণা এবং বিদ্বেষ আছে। যে মাটি হইতে সে জীবনরস আহরণ করিতেছে সেই মাটির সহিত সংস্রব ছিন্ন করিয়া কেমন করিয়া বাঁচিবে। বাস্তবের সহিত আত্মীয়তায় যে বিপদ আছে তাহার হাত হইতে সে বাঁচিল বটে কিন্তু তাহার প্রাণরসটুকুও ত' বাস্তবের হাতে, ইহা ছাড়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া! এই পৌত্তলিকতা ইচ্ছাকৃত হউক বা নাই হউক রাজনীতির আধুনিক

ধুরন্ধরগণ ইহাকে উপেক্ষা করেন না; ইহাকে তাহারা উৎসাহ দেন; কারণ "এই বাস্তববিদ্বেষী কলাবিলাসী মননজীবীদের "অপ্রযুক্ত" বুদ্ধির খেলায় জনসাধারণের বুদ্ধিমান অংশের মনোযোগ টানিয়া লওয়ার ফলে বহির্জগতে জাতিপুঞ্জের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের যে বিরাট সংগ্রাম চলিয়াছে সেদিকে আর তাহাদের নজর পড়ে না।" যে চিন্তার স্বাধীনতা থাকিলে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মপ্রভাব বিস্তারের সুবিধা হয় তাহা আমি চাই। কিন্তু একথা মানি না যে, যে দেখে তাহার আর কাজ করিবার প্রয়োজন হয় না। কেহ যখন ভালো করিয়া দেখিতে পায় তখন ভালো করিয়া কাজও সে করিতে পারে। "কাজ করিতে হইবে"। বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ (রেলজিসের দেওয়া নাম) "চিন্তার সেবকগণের" সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে দম্ভভরে দূরে থাকিবার কোনো অধিকার নাই। "মানুষের শ্রমজীবনের একটি বিশেষ অংশ তাহারা।" স্টালিন একটি ছোট্টকথায় ইহাদের নাম দিয়াছেন "ইনজিনিয়ার্স অব দি স্পিরিট।" শ্রমজীবী সহকর্মীগণের চেয়ে কোনো অংশে উঁচু বলিয়া ইহারা নিজেদের দাবী করিতে পারে না। শ্রমজীবী ছাড়া ইহাদের কোনো অস্তিত্ব নাই। দুই দলের কার্যের লক্ষ্য হইবে এক—বৃহত্তর মহত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠা। রেলজিস যখন তরুণদের জন্য আমার নিকট বাণী চাহিয়া পাঠাইলেন আমি লিখিলাম, "তাহারা যেন কখনও চিন্তা হইতে কর্মকে বিচ্ছিন্ন না করে।" যে সংগ্রাম আজ নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মহান যোদ্ধা হওয়ার চেয়ে চিন্তার আজ আর বড় কোনো কাজ নাই।

৮

আমি যখন হইতে কর্মের সৈনিক হইয়াছি সে কোনো অদূর অতীতের কথা নহে। ১৯০০ সালের লেখা আমার "জনসাধারণের রঙ্গমঞ্চ"

পুস্তকখানিতে আমি ফাউস্টের কথা দিয়া শেষ করিয়াছিলাম: "প্রারম্ভে ছিল কর্ম।" আমার সমস্ত বই-এর মধ্যে এই কথা আমি বলিতে চাহিয়াছি। আমার জঁা ক্রিস্তফ সেই ক্রিস্তফ যে শিশু পৃথিবীকে কাঁধে লইয়া নদী পার হইয়াছিল। আনেৎ, "বিমুগ্ধ আত্মা" সেই নদী যে-নদীর নামে তাঁহার নাম—"সেই জীবন্ত জলধারা"—সেই চিরপ্রবহমান জীবন। "মরণে পর্যন্ত আমরা সংগ্রামের পুরোভাগেই থাকিব।" এমনকি আর্টে, যে-আর্ট আমার কাছে আমার সমগ্র সত্তার সামিল, এবং সংগীতে বিটোফেন ও হাণ্ডল-এর মত সেই সকল মহাস্রষ্টাগণের দিকেই আমার আকর্ষণ বেশি যাহাদের সংগীত কর্মের প্রেরণা আনে। (আমার মানসলোক যখন ভারতবর্ষ হইতে তীর্থযাত্রা সারিয়া ফিরিল, অনন্তের যে স্থাণু স্বপ্নের মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে সেই চিন্তাকে সে সঙ্গে লইয়া ফিরিল না, সে সঙ্গে আনিল সেই সকল মহাপুরুষকে যাহারা স্বপ্ন হইতে শক্তি আহরণের মন্ত্র জানেন উত্তাল উদ্দাম কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে যাহারা দ্বিধা করেন না; সঙ্গে আনিল নেতা গান্ধীকে, বীর বিবেকানন্দকে।)

কিন্তু কর্মোন্মাদনার এই আগুন আমার পাহাড়ের আগুনের মতই দীর্ঘদিন বৃথাই জ্বলিয়া আসিতেছিল। এ আগুন জ্বলিতেছিল তখন "বাঁচিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবার উন্মাদনায়"। আমার জঁা ক্রিস্তফ আমার চোখ দিয়াই এই বাণীকেই পড়িয়াছিলেন আঁগাদিনের ঘরের সম্মুখে। বাঁচিবার জন্য বাঁচিয়া থাকা। যে স্নায়বিক অবসাদ ও নৈরাশ্যের যুগে আমার যৌবন কাটিয়াছে সে-যুগে এ বড় সহজ কথা ছিল না। কিন্তু ইহাই ত' যথেষ্ট ছিল না। রঙ্গমঞ্চে যে গায়কেরা গাহিতে থাকে 'চল আমরা যাই' অথচ কিছুতেই যায় না ইহাও যেন তাই, কারণ কোথায় যাইবে তাহা জানা ছিল না। এমন কি যে ক্রিস্তফ "কখনও দাঁড়াইয়া থাকে না।" সেও তাহার ভ্রাতা রদাঁর

সৃষ্টির মতই বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে। অথচ তাহার মাথা নাই, শুধু একটি স্পন্দমান শক্তিমান হৃৎপিণ্ড লইয়া একটি অপূর্ণাঙ্গ মানুষ সে; তাহার যে দীর্ঘ চরণ দু'খানি তাহাকে নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল, সে তাহার সহিত তাহার যুগকেও লইয়া গিয়াছিল। তাহার মত তাহার যুগও ছিল কবন্ধযুগ তথাপি সে আগাইয়া চলিয়াছিল "আগামী আলোকের" দিকে। কিন্তু কি সে আলোক? দেখা গেল সে-আলোক যুদ্ধ ও বিপ্লব। ক্রিস্তফ এই পাগলামির আভাস পূর্ব হইতেই পাইয়াছিল, দুইবার সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে করিতেও করে নাই। কোনো মতে পালাইয়া গিয়া "যুদ্ধের উর্দ্ধে" কোথাও লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া যদি তাহাকে লইয়া না যাইত তবে তাহার মত মহান চরিত্রের মানুষ দীর্ঘদিন এই উর্দ্ধে থাকিতে পারিত না—এক পক্ষ অবলম্বন তাহাকে করিতেই হইত। এবং "বিমুগ্ধ আত্মা" ষাট বৎসর বয়সে মৃত পুত্রের জন্য স্বেচ্ছায় সেই সংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমি নিজে ছিলাম। বেশিদিন ইহার বাহিরে আমি থাকিতে পারিতাম না। "ইউরোপে বিপ্লব প্রতিক্রিয়ার হাতে আক্রমণের উদ্যোগ রাখিয়া গিয়াছে, সম্মুখের ঘাঁটিগুলি শত্রু দখল করিয়াছে। ইউরোপের সর্বত্র ফ্যাশিজম্ নিজেকে নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার ত্রাণকর্তারূপে জাহির করিতেছে। সেই মহাশক্তিমান বুর্জোয়াশ্রেণী নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস হারাইয়া ড্যুচেদের ও ফুয়েরারদের হাতে হত্যা ও ধ্বংসের গদা তুলিয়া দিয়াছে আর এই ড্যুচেরা ও ফুয়েরাররা জনসাধারণের মধ্য হইতে আসিয়াছে বলিয়া এখনও তাহাদের শক্তি অটুট আছে। ইহারা নেকড়ের জাত বলিয়া আজ পাহারাদার কুকুরে পরিণত হইয়াছে। কালোই হউক কটাই হউক, এই মহামারি দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া

পড়িতেছে। যতই সাফল্য লাভ করিতেছে ইহার হিংস্রতাও ততই বাড়িতেছে। প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার দিন গিয়াছে। পক্ষে কি বিপক্ষে? হিংসা অহিংসা লইয়া শিক্ষালয়সুলভ আলোচনার কোনো মূল্যই আর আজ নাই। হিংসাই হউক অহিংসাই হউক, সকল শক্তিকে আজ প্রতিক্রিয়াশক্তির বিরুদ্ধে সংহত করিতে হইবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে সকলেরই স্থান করিয়া লইতে হইবে। এই দলে থাকিবে গান্ধীর সেই মহাশক্তিমান "না"। থাকিবে লেনিনের দুর্জেয় সৈন্যদল। বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতা, কারখানায় ও যানবাহন ব্যবস্থায় ধর্মঘট, সশস্ত্র উত্থান—এ-সব অস্ত্রই আজ আনেৎ-এর মন গ্রহণ করিয়াছে কারণ সংগ্রামের প্রয়োজন সে বুঝিয়াছে" (লা'মঁ সিয়াত্রিস-এর শেষ পর্ব)।

আমিও ইহা স্বীকার করিয়াছিলাম; আমিও সংগ্রাম করিয়াছিলাম। ১৯৩২ সালের বসন্তকালে বারবুসের সহিত আমি সর্বপ্রথম "বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সংযুক্ত ফ্রণ্ট" গঠনের জন্য আবেদন জানাই: "আসুন আমরা মিলিত হই! পিতৃভূমি (আমাদের আন্তর্জাতিক পিতৃভূমি) বিপন্ন"। (১৯৩২ সালের ১লা মে তারিখে ল্যুমানিতে ও প্রাভদা পত্রিকায় প্রকাশিত)।

ইহার একমাস পরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা একটি সম্মেলন করিলাম "যুদ্ধ তখন চারিদিক হইতে ঘনাইয়া আসিতেছে, বিপদের খড়্গ সমস্ত জাতির উপর উদ্যত"। এই সম্মেলনে আমরা প্রতিনিধি আহ্বান করিলাম "সমস্ত জাতির সমস্ত দলের সদভিপ্রায়যুক্ত সমস্ত নরনারীর"—আহ্বান করিলাম এমন একটি বিরাট মহাসম্মেলন যাহা "সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, সিণ্ডিকালিস্ট, এনার্কিস্ট, র‍্যাডিক্যাল সমস্ত বিভিন্ন মতের রিপাবলিকান, স্বাধীন ভাবুক ক্রিশ্চান, অ-দলীয় ব্যক্তিগণ, শান্তিবাদী, প্রতিরোধপন্থী, বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধী

স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগণ, ফ্রান্সে ও অন্যান্য দেশের তাহারা সকলে —যাহার যে কোনো উপায়েই যুদ্ধ নিবারণে সংকল্পবদ্ধ"। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাহাদের সকলেরই ঐক্যকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়াই ছিল এই মহাসম্মেলনের লক্ষ্য। যুদ্ধ, ফ্যাশিজম্ ও প্রতিক্রিয়া অভিন্ন কারণ সোশিয়ালিস্ট ও কমিউনিস্ট গঠনকার্যে একমাত্র প্রয়োজন শান্তির। বাঁচিবার জন্য, জয়ী হইবার জন্য এই শান্তি তাহার চাইই। সোভিয়েট ইউনিয়ন এ-কথা ভালোভাবেই প্রমাণ করিয়াছে।

"বিমুগ্ধ আত্মার" এই পরিকল্পনাটিকে আমি "যুদ্ধ-বিরোধী" সমস্ত দলের বিশ্বসম্মেলনের সম্মুখে পেশ করিলাম। ১৯৩২ সালের ২৭শে ও ২৮শে আগস্ট তারিখে আমস্টার্ডমে এই সম্মেলন হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের এবং সমাজতন্ত্রের জাতীয় দলগুলির গোপন ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রসত্ত্বেও এই বিরাট সম্মেলনের কি বিপুল প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তাহা আজ সুবিদিত। নেতাদের অপেক্ষা জনসাধারণ সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল; যদিও তাহারা নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল তথাপি নেতাদের তাহারা সম্মুখ পানে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছিল; এবং ধাক্কার পশ্চাতে ছিল ঐক্য ও সাধারণ ফ্রণ্টের অদম্য শক্তির তাড়া। আমস্টার্ডম্ সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সহিত জড়িত। সমস্ত দেহ মন দিয়া তিনি ইহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনই প্রথম সুদৃঢ় কেন্দ্র যাহাকে ঘিরিয়া যুদ্ধ ও ফ্যাশিজম্-বিরোধী শক্তিগুলির সুস্থ প্রভাব ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল।

৯

ঘটনার পর ঘটনা ঘটিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই জর্মানীতে ফ্যাশিজম্ তাহার অভিযান শুরু করিল। সমগ্র দেশকে চক্ষের পলকে পদানত করিয়া ফেলিল। আমার কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে

আমিও প্রথমদিন হইতে এই সংগ্রামে যোগ দিলাম। চালাইলাম তীব্র সাহিত্যিক অভিযান। ১৯৩৩ সালের অধিকাংশ ভাগ ইহাতেই কাটিয়া গেল।

আমি কতকগুলি ফ্যাশিজম্-বিরোধী ইস্তাহার প্রকাশ করিলাম এবং ১৯৩৩ সালের ৯ই মে তারিখের কোয়েলনিসে্ ৎসাইতুং পত্রিকায় একটি বিতর্কের সূচনা করিলাম (১৫ই জুন তারিখের ইউরোপ পত্রিকায় এই চিঠিখানি প্রকাশিত এবং সকল বিভিন্ন পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়)।

জার্মানীর প্রতি আমার পুরাতন সহানুভূতির কথা তুলিয়া কোয়েল-নিসে ৎসাইতুং আমার নিকট আবেদন জানাইলেন। ১৪ই মে তারিখের একখানি খোলা চিঠিতে আমার জবাব দিলাম: "যে জার্মানীকে আমি ভালবাসিতাম সে-জার্মানী ছিল তাহার মহান বিশ্বনাগরিকগণের জার্মানী—যাহারা অন্য জাতির সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের মত অনুভব করিতেন, বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন মনের সহিত সংযোগ সাধনের যাহারা চেষ্টা করিতেন। স্বস্তিকাধারি-গণের পায়ের তলায় সেই জার্মানী আজ দলিত, রক্তাক্ত, মথিত। নিজেদের নৈতিক অবনতি ও পাপের দ্বারা এই স্বস্তিকার ধ্বজা-ধারিগণ তাহাদের স্বদেশকে কলংকিত করিয়াছে। ১৯১৮ সালের বিজয় লাভের পর মিত্রশক্তিগণ জার্মানীর প্রতি যে চরম অবিচার করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাইয়াছি। তাহার উপর জোর করিয়া যে ভের্সাই-এর সন্ধি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমি তাহার পরিবর্তন দাবী করিয়াছি। অন্যান্য জাতির সহিত জার্মানীর সমতার দাবীও আমি জানাইয়াছি। আপনারা কি মনে করেন এইসকল দাবী আমি করিয়াছি আরও বড় অবিচারের জন্য। আপনারা কি মনে করেন এইসকল দাবী আমি তুলিয়াছি সে জার্মানীর

জন্য যে জার্মানী নিজে সমস্ত জাতির সমান অধিকারের নীতিকে এবং মানুষের নিকট পবিত্র মানুষের সমস্ত অধিকারগুলিকে নিজে পদদলিত করিয়াছে? হিটলারের জাতীয় সোশিয়ালিজম্ আসল জার্মানীর সবচেয়ে বড় শত্রু। ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আসল জার্মানীর নিকট আমি আবেদন জানাইতেছি।

বিপদ কেবল একদিক দিয়াই আসিল না। ফ্রান্সে সেই পুরাতন জাতিবিদ্বেষ আবার জাগিয়া উঠিল। হিটলারের নিপীড়নের ফলে যে ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হইল তাহার সুবিধা গ্রহণের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ফরাসী গণতন্ত্রের প্রত্যেক রূপের মধ্যেই যে ফ্যাশিস্ট ও সামরিক চক্রান্ত লুক্কায়িত ছিল এই সুযোগে তাহা ধুমায়িত করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে "যুবকগণের নিকট একটি আবেদন" আমরা প্রকাশ করিলাম (ফ্যাশিজম্ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুবসম্মেলনের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল)। ইহাতে কেবল হিটলারবাদকে আক্রমণ করিয়াই আমি ক্ষান্ত রহিলাম না। কি গণতান্ত্রিক, কি ধনতান্ত্রিক, কি মধ্যযুগীয়, কি সামরিক সর্বপ্রকারের ফ্যাশিজমকে আমি আক্রমণ করিলাম। আমি শ্লোগান তুলিলাম জাতীয়তাবাদই শত্রু।

জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্ন এখানে মনে, যুদ্ধ তাহাদের বড় ও ফুয়েরার কোম্পানীর বিরুদ্ধে—যাহারা তাহাদের অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বিভ্রান্ত করিয়াছে, নিপীড়ন করিয়াছে। "দুঃখ ও ক্লেশ বরণের মধ্য দিয়া আমরা সমস্ত দেশ, সমস্ত জাতির সহকর্মী; তাহাদের প্রতি আমরা আজ মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছি যাহাতে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এমন একটি মাত্র গণসম্মেলন গঠিত হইতে পারে, যাহা প্রতিক্রিয়ার পবিত্র সম্মেলনের বিরুদ্ধে একটা কঠিন প্রাচীরের মত দাঁড়াইতে পারে; আমাদের ফ্রণ্ট পৃথিবী ব্যাপী।" মঁদ এবং ফ্রঁ

মঁদিয়াল পত্রিকায় এই আবেদনটি প্রকাশিত হয়। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে আমি আন্তর্জাতিক ফ্যাশিস্টবিরোধী কমিটির সভাপতি মনোনীত হই। পারীর স্থুলা প্রেসোয়ার-এ এই সমিতির প্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন হয়।

১০

সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে আমাদের এই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। লাইফজিগের বিচার ও ডিমিট্রভের মুক্তিলাভ আমাদের প্রথম জয়লাভ, কিন্তু হিটলারবাদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। টর্গলের, থেলমান এবং-জার্মানীর অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দিগণের মুক্তিলাভের জন্য আমরা অভিযান শুরু করিলাম। ভিয়েনায় শ্রমিক বসতিতে বোমাবর্ষণের পরে (১৯৩৪ সালের ২১শে মার্চ ও ২০শে জুন) পরদিন ডালফাসকে আমরা তীব্র ভাবে আক্রমণ করিলাম। সেকুর রুজ আঁতেরনাসিয়নাল-এর সদস্য হিসাবে আমরা মুসোলিনীর কারাগার হইতে মহাত্মা গ্রানস্কি ও তাহার সঙ্গীগণকে বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম (১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর)। অস্টুরিয়াসের অপরাজিত বিপ্লবের প্রতি আমার সহানুভূতি জানাইলাম। কটা ও কালো মহামারীর বিরুদ্ধে আমার এই অভিযান আমি ভারতবর্ষে পর্যন্ত প্রসারিত করিলাম, কারণ সেখানেও তাহাদের প্রচারকার্য বিষ ছড়াইতেছিল (১৯৩৩ সালের ২৭শে নভেম্বর "ভারতীয় যুবকগণের প্রতি")।

পশ্চিমে "উদার" জাতিগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ("মীরাট মামলার বন্দিগণ", ১৯৩৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী)। "স্বাধীনতার সর্বশেষ দুর্গ" দালাদিয়েরের ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ("সাইগন বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে", ১৯৩৩ সালের মে মাস) আমরা যুদ্ধ

চালাইলাম। বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পারীতে ফ্যাশিজম্ চূর্ণ হইয়া গেল। আমি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিলাম (কলংক ধ্বংস কর, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ সাল) যুবকগণের নিকট আবেদন জানাইলাম (১৯৩৪ সালের মে মাস) এবং বণিকস্বার্থের ফ্যাশিজমের সহিত আত্মপ্রতারক ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর এ অপবিত্র সম্মিলনকে আমি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলাম। ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী তখন "মনের বিপ্লব" এই ছদ্মনামে তাহাদের স্বার্থপরতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছিল (১৯৩৪ সালের ১০ই জুন তারিখে সোভিয়েট সাময়িকপত্র The Scientific & Technical Front-এ প্রকাশিত হইবার জন্য এচাক-এর নিকট লিখিত চিঠি)। আমি আমার সঙ্গীদিগকে, বুদ্ধিজীবীদিগকে আহ্বান করিলাম সংযুক্ত ফ্রণ্ট গঠনের জন্য, শ্রমজীবীদের মধ্যে নামিয়া কাজ করিবার জন্য: "তাহাদের দেহ হইতে আমাদের জন্ম, তাহাদের স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীনতা, তাহাদের শক্তি আমাদের শক্তি। তাহারাই গাছের মূল কাণ্ড; বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা এইগুলি বিভিন্ন শাখামাত্র। কাণ্ড যদি দুর্বল হইয়া যায় তবে শাখাও শুকাইয়া যাইবে। বুদ্ধিজীবী সুবিধাভোগী শ্রেণী; শোষণকারীরা তাহাদের যে সম্মান ও সুযোগ সুবিধা দেন তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া তাহারা সাধারণ আদর্শের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে। যে গাছকে আমরা টবের মধ্যে আনিয়া বাসাইয়াছি সেই গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া ফুলের মত তাহাদের অবস্থা। অল্পকালের জন্য তাহাদের দীপ্তি থাকে তারপর তাহারা শুকাইয়া যায়; লোকে তখন সেগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে, হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, মানব সমাজের দলনকারীর বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আবেদন জানাও। ধনিকের ধনমত্ততা, সাম্রাজ্যবাদীর ক্ষমতা-মত্ততা, বৃহৎ ব্যবসায় কোম্পানীগুলির একনায়কত্ব, রক্তপানমত্ত

ফ্যাশিজমের নানারূপ—এই সকলের বিরুদ্ধে জীবনের নিকট আমি আবেদন জানাই। হে শ্রমজীবী শ্রেণী, আমরা হাত প্রসারিত করিয়া দিতেছি, আমরা তোমাদেরই,—আমাদের মিলিত হইতে দাও। আমাদের মধ্যকার বিভেদ ঘুচিয়া যাক, সমগ্র মানবজাতি আজ বিপন্ন (স্নেকুর উভ্রিয়ে আঁতেরনাসিয়নাল নামক পুস্তিকার জন্য ১৯৩৪ সালের ১লা মে তারিখে লিখিত)।

যুদ্ধের ঠিক মধ্যেই বইখানি শেষ হইয়া যায়। এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই যুদ্ধ ১৯১৪ সালের যুদ্ধের উর্ধ্বে পুস্তকের বিরোধী নহে। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। "জাতি ও সভ্যতার দম্ভ লইয়া এই যুদ্ধের উৎপত্তি—ইহার ফলে উভয় পক্ষই ধ্বংস হইয়া গেল। ১৯১৪ সালে এই যুদ্ধের উর্ধ্বেই আমি ছিলাম এবং আমৃত্যু থাকিব" (১৯৩৩ সালে ১৬ই ডিসেম্বর আঁদ্রে বেরতেকে লিখিত চিঠি)। "যে যুদ্ধ সত্যকারের যুদ্ধ, যে যুদ্ধের প্রয়োজন ও বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে যুদ্ধ হইবে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গণে। সামাজিক, নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরাতন ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগতকে ধ্বংস করিয়া যাহারা নূতন জগত সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন তাহাদের সকল কর্মে সকল আশায়, সকল দুঃখবেদনার মধ্যে আমি আছি।" এবং যেহেতু শ্রমিকবিপ্লব আজ "আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে চলিয়াছে, এবং যে সংগ্রামের জন্মলাভের ফলে শ্রেণীহীন, ভৌগলিক ব্যবধানহীন নূতন মনুষ্য সমাজের সৃষ্টি হইবে সেই হেতু এই বিপ্লবে আমরা পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।

জাঁ ক্রিস্তফ-এ, কোলা ব্রোঞয়ঁ, ক্লেরাঁবোল-এ আমি ব্যক্তিগত বিবেক ও স্বাধীন মনের শক্তিকে উচ্চ আসন দিতে গিয়া যাহা কিছু বলিয়াছি বা করিয়াছি আমার বর্তমান মত ও পথের সহিত তাহাদের অসামঞ্জস্য নাই; তাহারা ও আনেৎ-এর মত বিপ্লবের বাহিনীতে যোগদান

করিয়াছে। ইহার কধ্যে আকস্মিক বা অদ্ভুত কিছু নাই, তাহাদের বিকাশের নিয়মানুসারেই ইহা হইয়াছে।

কিন্তু এই বিকাশের পশ্চাতে যুক্তির প্রেরণা ততটা ছিল না যতটা ছিল তাহাদের ও আমার মানসিক প্রকৃতির প্রেরণা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যুগে আমাদের এই মানসপ্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল ; এই যুগের আব-হাওয়ায় যে চিন্তার দৈন্য ও বিহ্বলতা দেখা দিল আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে তাহা আঘাত করিয়াছিল, আছন্ন করিয়াছিল ; কিন্তু কর্মের মুখোমুখি আসিয়া আমি কিংবা আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি কখনও পথ ভুল করে নাই। আমরা চিরদিনই ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে লড়াই করিয়া আসিয়াছি।

জঁ। ক্রিস্তফ, কোলা, ক্লেরাঁবোল, আনেৎ ও তাহার পুত্র বাঁচিয়াছিল ও মরিয়াছিল সমস্ত মানুষের কল্যাণে। সমাজ হইতে তাহাদের লক্ষ্যবস্তুকে পৃথক করিবার কথা তাহাদের কাহারও মনে হয় নাই— "সবার বিরুদ্ধে যে একক" এই লক্ষ্যবস্তুকে বাঁচাইবার জন্য যে অন্য সকলের বিরোধিতা করিয়াছিল একথা তাহারও মনে হয় নাই। জনগণকে তাহাদের প্রয়োজন ছিল সেবা করিবার জন্য সেবিত হইবার জন্য নহে। মনে, কাজে আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া তাহারা জনগণের মধ্যে নিজেদের মিলাইয়া দিয়াছিল। তাহারা নিজেরাও ছিল জনসাধারণ— কর্মরত শ্রমজীবী জনসাধারণ। তাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল মূলত সমষ্টিগত ; পথে ছায়া দেখিলে ঘোড়া যেমন হঠাৎ মাথা তুলিয়া পিছু সরিয়া আসে তেমনি আমার মত তাহারাও তাহাদের পবিত্র "স্বাতন্ত্র্যবাদে" বাহিরের স্পর্শ পাইবামাত্রই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই স্বাতন্ত্র্যবাদের মত মোহময় কথাগুলির জন্য আমরা সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ; কেবলমাত্র দীর্ঘ বেদনাময়, মোহ ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার পর আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের এই বিশ্বাস,

সত্য ও সঙ্গত বিশ্বাস, এমন মৃত ও গলিত কতকগুলি দেবতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলে যাহাদের সাহায্যে একটি চতুর সংস্কৃতি আমাদের প্রবঞ্চিত ও এইসকল কথাগুলিকে শূন্য করিয়া অহরহ সেগুলি এমন স্বার্থ দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তোলে—কথাগুলির মূল ভাবের যাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও ব্যক্তিমানুষের অধিকার—এ সকলের বেলাও এই কথা খাটে। কী তীব্র অন্ধ আবেগেই না আমরা এইগুলিকে আগলাইয়াছি, দেখিতে পাই নাই যে, যে-জিনিস আমরা প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতেছিলাম সে-জিনিস আসল জিনিস নহে, আসল জিনিসের আত্মসাৎকারী বণিকের ট্রেডমার্ক মাত্র। মেয়েদের মত কথাও আমাদের প্রবঞ্চনা করে। আমাদের সমস্ত ভাবাদর্শ, সমস্ত স্বপ্ন লইয়া আমরা কথার বাহুবন্ধনে ধরা দেই। আমদের স্বপ্নকে যাহারা প্রতারিত করে, আমাদের আদর্শের যাহারা পরম শত্রু, যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহাদের হাতে সেই আদর্শকে বিকৃত করিতে দিয়া কথার মোহে আমরা ভুলিয়া থাকি।

প্রত্যেক যুগেই দেখা যায় সুইফ্‌ট-ভল্‌তেয়ার প্রমুখ স্বাধীনচেতা যে-সকল লেখক শাসকশ্রেণীর আশ্রয়পুষ্ট হইতে অস্বীকার করিয়াছেন, নিজেদের রচনা দ্বারা তাহাদের কপটতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহারাই যুগের ও শাসকশ্রেণীর কপটতার মুখোশ বারংবার খুলিয়া দিয়াছেন—যে-যুগ ও যে-শাসক মানুষের মহান ও পবিত্র ভাবধারাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া রাখে। স্বাধীনচেতা লেখকের কর্তব্য সেই প্রচেষ্টাকে যুগে যুগে বারংবার উজ্জীবিত করিয়া তোলা। কথার মোহ, কথার পৌত্তলিকতা বর্তমান গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠে অগণ্য মানুষের মুখে মুখে, "স্বাধীন" (অর্থাৎ বিক্রয়যোগ্য) সংবাদপত্রগুলির পূতিগন্ধময় নর্দমাধারার মধ্য দিয়া, গণপরিষদের গণিকাদের সহস্র সংস্পর্শে। বিশ্বযুদ্ধের

কল্যাণে এই মিথ্যার সুযোগ ও সুবিধা বাড়িয়া গিয়াছে বহুগুণ, মিথ্যার শক্তি যে কতখানি মিথ্যাবাদীরা তাহার জীবন্ত সাংঘাতিক প্রমাণ পাইয়াছে; কিন্তু কথার মোহজালে আচ্ছন্ন মানুষের একদল আজ স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছে "ন্যায়" ও "স্বাধীনতা"র মত তাহাদের প্রাণপ্রিয় কথাগুলিকে হত্যাকারী কপটের দল কিভাবে আপনার কাজে লাগাইতে পারে। ইহাদের আঘাত করিবার জন্য আজ আমাদের দরকার একজন ভল্‌তেয়ারের, কিন্তু ভল্‌তেয়ার আমাদের নাই তাই আগুন আমরা নিভাইতে পারি নাই।

এ-যুদ্ধের অপরপক্ষে ছিল শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলন, যে-আন্দোলন হইতে আমরা মুক্তির দৃষ্টান্ত পাইতেছিলাম। সে-পক্ষে এমন অনেক শক্তিশালী লোক ছিলেন যাহারা নিজেদের স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি ও উদীয়মান নূতন জগতের বলিষ্ঠ বাস্তবতার বলে বড় বড় আদর্শগুলির মুখ হইতে বুর্জোয়া-সভ্যতা-প্রদত্ত মিথ্যা মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িতে পারিয়াছিলেন। নূতন জগতের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমাদের মনকে প্রভাবিত করিতে হইলে প্রয়োজন নিৎসের মত শক্তিশালী লেখকের (আমি এখানে তাহাকে আর্টিস্ট হিসাবেই উল্লেখ করিতেছি, উন্মাদ ভাবুক হিসাবে নহে)। সংঘর্ষের মত্ততার মধ্যে যাহা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তাহার বিপুল সমালোচনার দিকেই মন স্বভাবতই ধাবিত হয়; নূতন মানুষ সত্যকার স্বাধীন মানুষ, যে-মানুষ আপনাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে সেই মানুষ, "সবার সাথে মিলিয়া যে মানুষ এক" সেই-মানুষ সৃষ্টির উদ্দীপনা ও উন্মাদনার দিকে মন প্রথমত যাইতে চাহে না।

বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মর্মস্থলকে নির্মম স্বচ্ছতার সহিত কার্ল মার্কস্ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের কাছে তাহার প্রতিভার এইটাই সবচেয়ে বড় কথা। যে-মোহজালে আমরা নিজেদের অচ্ছন্ন

হইতে দিয়াছিলাম তাহা তিনি ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন, আমাদের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করিবার বিপদ বরণ করিয়াও তিনি আমাদের মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "গণতান্ত্রিক আইনের তালিকা লিপি" এবং "মানুষের স্বাধীনতা" এই দুইটি বাণীর মধ্যে কতখানি সত্যকার স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিমানুষকে ঐগুলি যে কত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা মার্কসের মত এতখানি চোখে আঙ্গুল দিয়া আমাদের আর কেহ দেখাইয়া দেয় নাই।

"কি লইয়া তাহাদের এই স্বাধীনতা? ছয় নম্বর বিষয়বস্তু: 'অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া যাহা খুশি করিবার ক্ষমতাই স্বাধীনতা' অথবা ১৭৯১ সালের ঘোষণাবাণী অনুসারে; 'অপরে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এমন সব কিছু করিবার ক্ষমতাই স্বাধীনতা' ইহাতে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া মানুষের বিচরণের ক্ষেত্রকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে: মানুষকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; একের সহিত অপরের মিলনের স্বাধীনতার উপর মানুষের ভিত্তি রচিত হয় নাই, রচিত হইয়াছে মানুষের নিকট হইতে মানুষের বিচ্ছিন্ন হইবার স্বাধীনতার উপর। এই অধিকার সেই বিচ্ছেদের অধিকার, সীমাবদ্ধ ব্যক্তিমানুষের অধিকার, আপনাতে আপনি আবদ্ধ হইয়া থাকিবার অধিকার··· স্বার্থপরতার অধিকার···এই ব্যক্তিস্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষ অপরের মধ্যে তাহার নিজের স্বাধীনতার বিকাশ দেখে না, দেখে পরিসমাপ্তি। মানুষের এই ঘোষিত অধিকারগুলির কোনোটিই স্বার্থপর মানুষকে, বুর্জোয়া মানুষকে ছাড়াইয়া যায় না। বুর্জোয়া যুগের এই স্বার্থপর মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত কামনায় এমনভাবে অন্তর্মুখী হইয়া থাকে যাহাতে মনে হয় সে যেন সমগ্র সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র জীব। (Zur Fadenfrage, ১৮৪৩)।

যে-অহংকার নিজেকে চেনে, চেনে না নিজের দীনতাকে, সেই

অহংকার বুর্জোয়া সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মনে। ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক সম্প্রতি তাহার বিশ্বাস ঘোষণা করিয়াছেন। যদিও ইনি আমার বন্ধু তথাপি তাহার ভাবধারার সহিত আমার বিচ্ছেদ আমি বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করি। তিনি লিখিতেছেন: "বিরাট ব্যক্তিপুরুষ কেবলমাত্র নিজের জন্যই জীবনধারণ করেন……নিষ্ঠার সহিত এই আদর্শে আসক্ত থাকিবার মত শক্তি ও মহত্ত্ব তাহার আছে। যে-জনগণের উপর তিনি প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন সেই জনগণের জন্য জীবনধারণ করিতেছেন বলিয়া ছলনা তিনি করেন না। (ড্যু স্যুর লে'রোপ, N. F. R. ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৪)।

এই যে বড় বড় কথার আচ্ছাদনে তিনি নিজেকে সাজাইয়াছেন ইহার আড়ালে রহিয়াছে জীর্ণ চীর। তিনি নিজেকে স্বাধীন মনে করেন, নিজেকে মনে করেন ঈশ্বর ও প্রভু। কি লইয়া তাহার রাজত্ব! ধ্বংসস্তূপ। "বুর্জোয়া সমাজের দাসত্বকে বহির্দৃষ্টিতে মনে হয় সব চেয়ে বেশি স্বাধীনতা। কারণ, মনে হয় ইহা যাহা দিতেছে তাহা পরনির্ভরতা হইতে ব্যক্তিমানুষের পূর্ণ মুক্তি। কিন্তু এইখানে সম্পত্তি, শিল্প, (Industry), ধর্ম প্রভৃতি যাহা কিছুর সহিতই তাহার জীবনের যোগ নাই তাহারই অবাধ বিচরণের স্বাধীনতাকে সে নিজের স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করে।" (মার্কস: Holy Family)।

লেখক হিসাবে আমার কর্তব্য (এবং এই কর্তব্য কচিত-কদাচিত আংশিকভাবে আমরা পালন করিয়াছি) এই অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো, মার্কসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 'অবাস্তব মানুষ' হইতে মানুষকে সাহস ও শক্তির সহিত মুক্ত করিয়া আনা, মানবীয়তার সহিত সাম্যবাদের একাত্মতা বা স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত মিলন ঘটানো। আঁদ্রে মালরো শিল্প ও সোভিয়েট সভ্যতা সম্পর্কে তাহার চমৎকার বক্তৃতায় এই কথাই বলিয়াছেন (অক্টোবর, ১৯৩৪)।

কিন্তু তিনি বলেন এই মানবীয়তার সূচনা নূতন যুগ হইতে, এবং পূর্ববর্তী যুগে ইহা ছিল বলিয়া তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। পূর্ববর্তী যুগ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐ যুগে মানুষ 'নিজের সভ্যতাকে অস্বীকার' করিয়াছে। এইখানেই তিনি ঐতিহাসিক বিবর্তনকে খুব বেশি সহজভাবে বা খুব বেশি বড়ভাবে দেখিতেছেন। আমার মনে হয়, মানবতার একমাত্র ধারক ও বাহক বলিয়া পূর্ববর্তী যুগ উদ্ধত দাবী জানাইয়াছে বলিয়াই মালরো তাহাকে মানবীয়তা হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করিয়া তাহার উপর প্রতিশোধ লইয়াছেন। সত্যকার মানবীয়তা যদি পরিপূর্ণ, সচেতন ও সভ্য মানুষের সন্ধান হয়, যদি উহাতে সবার সহিত একের মিলনের উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়, তবে মানবীয়তাই ছিল অতীতের চিন্তানায়কগণের মূল সুর। 'Ode to Joy' ও 'Ninth Symphony'র মধ্যে 'মানুষের মিলনের মহিমা'র ও ভ্রাতৃত্বের তীব্র উপলব্ধির যে-বাণী শোনা যাইতেছে যে-দুই মহাচেতনার অভ্যুদয়কে মালরো আজ স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছেন তাহা উপলব্ধির জন্য শীলারের সহিত বিটোফেন ত' নবযুগের অভ্যুদয়ের জন্য বসিয়া ছিলেন না।

আজ যে সকল মহান শিল্পী নবযুগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছেন তাহারা তাহাদের পূর্বাচার্যগণের মত প্রভাতের পূর্বেই দিনের আবির্ভাবকে ঘোষণা করিতেছেন না। আজ অবশেষে তাহাদের আহ্বানে সেই দিন সমাগত। আজ আর্টের আদর্শ ও সমাজসংগ্রামের মধ্যে মিলনের সেতু প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্টের স্বপ্ন আজ আর প্রতিভার ধ্যানদৃষ্টি নহে; সে-স্বপ্নে আজ বাস্তবের ঠাসবুনানি। বাস্তব জগতেই সে-স্বপ্ন আজ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। মানুষের মনে আজ এক সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়াছে—নিরাপত্তার অনুভূতি, আজ আর আগের মত মানুষ জলের উপর হাঁটে না।

ভগ্‌নার যখন তার 'ত্রিস্তান' লেখেন তখন ইউরোপে কেহ উহা শুনিবার বা বুঝিবার নাই বলিয়া হতাশায় তিনি নাকি উহা রিও ডিজানিরোর এক কাল্পনিক শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য লিখিয়াছিলেন। আগামী যুগের উপযোগী আর্ট সৃষ্টি করিয়া প্রতিভাবান আর্টিস্টগণকে সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ মানুষের এমন ছবি মনের মধ্যে আনিতে হইয়াছিল যাহারা তাহার আর্ট বুঝিতে পারিবে। আজ তাহাদের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির সেই শ্রোতৃ-সাধারণ সমুপস্থিত। আমরা আজ আর একা নই। আমরা একসঙ্গে কথা কহিয়া চলিয়াছি। যদিও সমাজের বর্তমান স্তরকে আঘাত দিয়া একটু আগাইয়া দেওয়া, আগামীদিনের বাস্তব সম্পর্কে স্বপ্ন আনিয়া দেওয়া মহান শিল্পীর চিরদিনের কর্তব্য থাকিবে, তথাপি তাহার স্থান অন্যান্য মজুরের মধ্যেই। আজ তাহারা সকলেই একসাথে একই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতেছে। আগে যাহারা উপাসনা মন্দির নির্মাণ করিত তাহারা খাটিত।

আজ আমাদের চোখের আচ্ছাদন খুলিয়া গিয়াছে। যে স্বাধীন শক্তি-নিচয়ের মুক্তির জন্য আমরা অন্ধের মত এতকাল ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, এক সমাজতান্ত্রিক সমাজে আজ তাহার সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ শুরু হইয়াছে। এ সম্পর্কে আমরা দীর্ঘদিন যে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়াছি তাহার মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। (কিন্তু ক'জন সমাজতন্ত্রীই বা উহা তখন বুঝিয়াছিল!) স্বাধীন ব্যক্তিমানুষের সহযোগিতা ও সম্মেলনের উপর যে-সমাজ গড়িয়া ওঠে সে-ই সমাজতন্ত্রী সমাজ। মার্কস্‌ নিজেই ত' বলিয়াছেন: "সকলের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ।"

সম্প্রতি (২৩শে জুলাই, ১৯৩৪) এইচ. জি. ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎকালে স্টালিন ওয়েলসের মধ্যশ্রেণীসুলভ ভীতিতে সান্ত্বনা দিয়া

তাহাকে দেখাইয়া দেন যে, "ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টিমানুষের স্বার্থের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই, থাকা উচিত নয়। দু'এর মিলন ঘটাইতেই হইবে। কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে পারে।"

স্টালিন স্বার্থ সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছেন; ভাবধারা সম্পর্কেও সেই কথাই বলিতে পারিতেন। বুর্জোয়া ব্যবস্থার কঠিন মুঠিতে পিষ্ট হইয়া সমস্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্কৃতি আজ মরিতে চলিয়াছে। স্থবির কাপুরুষ পাশ্চাত্য সমাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার হাতেই নিজের শক্তিশালী মনস্বীদের সঁপিয়া দিয়া আসিতেছে। আজ এই সমাজের নূতন জন্ম হইতেছে, মজুরশাসিত সমাজের উর্বর মাটিতে পুরাতন তরু নবজীবন লাভ করিতেছে; লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ-রসে পরিপুষ্ট হইয়া এই তরু দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে।

কয়েকমাস আগে (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) মস্কোতে পারস্যের প্রাচীন কবি ফেরদৌসীর সহস্রতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। লেনিনের এই বাণীকে স্মারক করিয়া উৎসব শুরু করা হয়: "মানব-সমাজের সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়া যে-সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছে তাহার নিখুঁত জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়াই শ্রমিকসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে।"

এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি এনুকিজে বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন গ্যয়টে ও বিটোফেনের শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন করিয়াছে এবং আজ সে পুস্কিনের শতবার্ষিকী ও বিখ্যাত জর্জীয়ান কবি রুস্তাভেলির ৭৫০তম বার্ষিকী করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তিনি ঘোষণা করেন: "মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি তাহাদের সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়া যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সবচেয়ে ভালোটুকু আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কারণ নূতন সমাজের নির্মাণকার্যে আমরাই মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদের উত্তরাধিকারী।"

চিরজীবন আমরা এই স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছি—সর্বজনীন প্রাণের স্বপ্ন ; এই স্বপ্নই আজ জয়ী হইয়াছে। সুদীর্ঘ মৃত্যুনিদ্রা হইতে জাগিয়া, অতীতের কবর হইতে এই স্বপ্ন বাহির হইয়া নূতন জীবনের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে। ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফেদর গ্ল্যাডকভ ও ইলিয়া সেলভিনস্কিকে লিখিত এক পত্রে অমি সেক্স-পিয়রের এণ্টনি ও ক্লেঅপেট্রার সেই অনৈসর্গিক দৃশ্যের উল্লেখ করি যেখানে "পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী মহাসংগ্রামের পূর্বসন্ধ্যায় অন্ধকারে এণ্টনির শিবিরের উপর আকাশে রহস্যময় সংগীত ভাসিয়া যাইতে শোনা গেল—যেন কোন অদৃশ্য অশ্বারোহীদল সংগীত ও বাদ্যের সমভিব্যাহারে চলিয়া গেল।...ইহা ডিওনিসসের অশ্বারোহী-দল ; পুরাতন জগতের দুই দেবতা মানবীয়তা ও স্বাধীনতা তাহার শিবির ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।"

তাহারা নূতন সমাজব্যবস্থার দিকে চলিয়া গিয়াছে ; তাহাদের পূজারী আমরাও তাহাদের পিছু চলিয়াছি। তাহাদের আমরা সেবা করিতে চাই, যে-সমাজে তাহারা উদ্দীপনা আনিবে সেই সমাজকে আমরা সেবা করিতে চাই। আমার বুকে তাহাদের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে বলিয়াই আমি শেষে নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছি। যে পথে আসিয়াছি সে পথ অন্ধকার কণ্টকাকীর্ণ। সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন, কখনও পড়িয়াছি আবার উঠিয়াছি ; কখনও পথ হারাইয়াছি আবার পথ পাইয়াছি, আবার দৃঢ়পদে যাত্রা শুরু করিয়াছি। এ শিখার উজ্জ্বলতা যেন চিরদিনই বাড়িয়া চলে। মুক্ত আত্মা যেন মুক্ত মানুষকে, বিশ্বজনীন সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রগুলির জনগণকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে। এই জনগণসম্মেলনই পৃথিবীতে আনিবে শান্তি, মানুষের শ্রমের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে অবাধ প্রগতির প্রান্তরভূমি।

ভাষ্য ও মন্তব্য

১। বার্লিনের সাময়িক পত্রিকা Demokratieতে ১৯১৯ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে ডাঃ নিকোলাই কর্তৃক 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী' (Declaration of Independence of Thought) প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে ফোরাম পত্রিকায় ভিলহেল্‌মস্‌ হার্জগ উহা প্রকাশ করেন; জুন মাসে ব্রুসেলসের লা'র্‌ লিব্‌র্‌ পত্রিকায় পল কলঁ্যা কর্তৃক উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। বিদেশে ইহাদের প্রত্যেক সংস্করণগুলিতে বহু নূতন সমর্থনকারী স্বাক্ষরদান করেন।

লে প্রেক্যুরসোর পুস্তকে প্রকাশিত এই ঘোষণা বাণীর নিম্নে যাহাদের স্বাক্ষর ছিল তাহাদের নাম আমরা জানিলাম সত্য, কিন্তু ভয়ে অথবা জাতীয়তাবাদী একগুঁয়েমিতে যাহারা স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করিলেন তাহাদের নাম ইতিহাস ভুলিবে না। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শার্ল জিদ, ডাঃ রিশে, মাদাম ক্যুরি; লুসিতানিয়া নিমজ্জনের কথা ইহারা ভুলিতে পারিলেন না। আপাতবিরোধী বাক্‌বিশারদ বর্নার্ড শ বলিলেন, লেখনী দিয়া যাহারা যুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা অন্যায় করেন নাই; আনাতোল ফ্রাঁস স্বাভাবত একেবারে চুপ করিয়া রহিলেন। ঐ কয় বৎসরে আমার ডায়েরীতে এই সবের চমৎকার একটি সংকলন আছে; আর আছে ইহাদের সম্পর্কে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নিকট আমার একখানি নৈরাশ্যপূর্ণ চিঠি।

২। "এখন হইতে লাইবনেক ও রোজা লুক্সেমবুর্গের রক্ত মজুরশ্রেণী ও দলত্যাগী সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে অপার সমুদ্রের মত বহিয়া

চলিবে। নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে অবস্থা এইভাবে পরিষ্কার হইয়া যাওয়ায় ভালই হইয়াছে, কিন্তু রাজনৈতিক বিপদ রহিয়াছে সাংঘাতিক। ফ্রান্সে ইহা কেহই বুঝিতেছে না। সিডারম্যানেরা ও এবার্টরা আজ প্রতিক্রিয়ার শিবিরে বন্দী। সাম্রাজ্যবাদী সমরতন্ত্রের বিরাট ধ্বংসস্তূপকে লইয়া পার্লামেণ্টারী সমাজতন্ত্রের কৌটিল্যগণ একটি নূতন দল গঠন করিতেছে; ফ্রান্স যেন সতর্ক থাকে। স্পার্টাসিস্টদের নিকট হইতে সামাজিক বিপদ আসিতে পারে এই আশঙ্কায় ফ্রান্সের গভর্নমেণ্ট অভিভূত হইয়াছে। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মিলনের স্পৃহাই যে স্পার্টাসিস্টদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিল না; বুঝিল না যে, জাতিগত প্রতিহিংসা ও অনির্বাণ বিদ্বেষবহ্নির মনোবৃত্তি নূতন শিডম্যান-এরৎসবের্গের-নস্‌ক-লুডনডর্ফ সহযোগিতার মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে। (১৯১৯ সালের ৩১শে জানুয়ারী লা'ভনির আঁতেরনাসিয়নাল পত্রিকায় প্রকাশিত।) আমার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না ইতিহাস তাহা প্রমাণ দিল। এবার্ট-নস্‌ক-শিডম্যানের বড় বড় পাণ্ডারা হিটলারের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছেন। ১৯৩৪ সালের ২২শে মার্চ তারিখে Arbeiter Illustrierte Zeitung পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি ফোটোগ্রাফে দেখা যায় রাইখের প্রেসিডেণ্ট এবার্টকে ঘিরিয়া আছেন হপ্‌ম্যান ও রিটার ফন্‌ এপ। শেষোক্ত ব্যক্তিই পরবর্তীকালে ব্যাভেরিয়ায় হিটলারের তাঁবেদার হইয়াছেন। ব্রাউন শার্ট' দলের আরও অনেক অগ্রণী ব্যক্তি যথা, রোম, ফনকিলিংগার, লেভেৎসোভ, হাইনে—নস্‌ক-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করেন।

৩। যুদ্ধবিরতি ও শান্তির মধ্যবর্তীসময়ের প্রথম তিনমাস আমি একাধারে জার্মানীর ও অন্যদিকে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য প্রয়াস পাইলাম। ফ্রান্স ও

জার্ম্মানীর বিপ্লবী ছাত্রগণের (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯), মিউনিকের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রগণের ও তাহাদের ফরাসী কমরেডগণের (মার্চ ১৯১৯) এবং বার্লিনের International Jugenbund ও Kameraden Revolutionare Studenten Frankreichs (মার্চ-এপ্রিল, ১৯১৯) এর মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করিলাম। ফ্রান্সে লিখিত আমার কতকগুলি চিঠিপত্র তাহাদের হাতে পৌঁছায় এবং উহা ল্যুমানিতেয় প্রকাশিত হয়, অপরগুলি ফরাসী সেন্সর আটকায়। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায়ের সহানুভূতির কথা ফ্রান্স যাহাতে না জানিতে পারে সেজন্য সেন্সর সবচেয়ে বেশি কড়া হইয়া ওঠে।

৪। যুদ্ধের মধ্যেই আমরা এই আদর্শকে উচ্চে আসন দিয়াছি। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে রেভ্যু পলিতিক আঁতেরনাসিয়নাল প্রকাশিত এবং লে প্রেক্যুরসোর-এ সুমুদ্রিত 'চিন্তাজীবীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ' নামক আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। ক্লার্তের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ১৯১৯ সালের জুন-জুলাই মাসে ভিলদার্ক, সিগন্যাক, ভের্ত, বাজালজেৎ, সেনেভিয়ের, ডয়েন, ক্রুসি ও আমি সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে শুরু করি। আগস্টমাসে কম্পাসের কাঁটা হটাৎ একলাফে অসহিষ্ণু গোঁড়ামির প্রত্যন্ত দেশে চলিয়া গেল, আমাদের প্রতিক্রিয়াও হইল একেবারে বিপরীত দিকে; কিন্তু ঐক্যবদ্ধ আমরাও কম হইলাম না। বারবুস, হ্যুআমেল ও আমি প্রথম 'বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস' প্রকাশ করিলাম (২৪শে জানুয়ারী, ১৯২০)।

৬। ক্লেরাবোল। ভালমণ্ট ক্লিনিকে রুগ্নাবস্থায়, রোগের সবচেয়ে সংকটাপন্ন সময়ে ইহার শেষ ভাগ (বিশেষত ইস্টার ফাইডের দীপসজ্জার কথা) লিখি। ১৯২০ সালের শেষদিকে বইখানি পারীতে বসিয়া শেষ করি এবং মে মাসের প্রারম্ভে 'সবার বিরুদ্ধে একা'

এই আসল নাম দিয়া প্রকাশকের নিকট পাণ্ডুলিপি পাঠাই। ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে বইখানি বাহির হয়।

৭। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে সোয়েনেকে দিলীপকুমার রায় নামক জনৈক ভারতীয় বন্ধুর মুখে গান্ধী ও তাহার ব্যক্তিত্বের কথা প্রথম শুনি। কিন্তু ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও পরে ১৯২২ সালে এপ্রিল মাসে কালিদাস নাগের পারী আগমণ পর্যন্ত আমি তাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই। ইতিমধ্যে মাদ্রাজের প্রকাশক গণেশন্ গান্ধীর কতকগুলি ইংরেজী প্রবন্ধের (ইয়ং ইণ্ডিয়া) প্রুফ আমার নিকট পাঠাইয়া দেন ও ঐগুলির জন্য আমাকে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে যথেষ্ট মিল না থাকায় আমি অস্বীকার করিলাম, গণেশনকে লিখিলাম, "গান্ধীর মধ্যে আমি একজন "আদর্শবাদী-জাতীয়তাবাদীকে দেখিতেছি" "তিনি-ভাবাদর্শী জাতিয়তাবাদের মহত্তম পবিত্রতম প্রতীক।" কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আমার আন্তর্জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমি ছাড়িতে চাহিলাম না। আমি জানাইলাম, চিন্তা ও কর্মের এই বিরাট ব্যবস্থা সম্পর্কে হটাৎ কোনো অভিমত প্রকাশ করিবার মানুষ আমি নই; যতদিন পর্যন্ত গভীরভাবে ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইহা অধ্যয়ন করিতে না পারিতেছি ততদিন আমি অপেক্ষা করিব। অপেক্ষা আমি করিলাম, অধ্যয়ন যখন আমার সমাপ্ত হইল তখন আমি মুগ্ধ। ১৯২২-২৩ সালের শীতকালের সমস্ত সন্ধ্যাগুলি আমি আমার ভগ্নীর সহিত গান্ধীর প্রবন্ধগুলি পড়িলাম। ১৯২৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'গান্ধী সম্পর্কে রচনা' লিখিলাম; তিনটি প্রবন্ধের আকারে উহা প্রকাশিত হইল ইউরোপ পত্রিকার ১৯২৩ সালের মার্চ, এপ্রিল ও মে সংখ্যায় (পত্রিকাখানি সবেমাত্র শুরু হইতেছে)।

পরে ঐগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ১৯২৩ স্যালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে। ইহার পর আমারই উদ্যোগে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' নামক গান্ধীর প্রবন্ধগুলির একটি ফরাসী অনুবাদ বাহির হইল; আমি উহার ভূমিকা লিখিলাম (১৯২৫ সালের জুলাই মাস)।

৮। এই সময়কার নানা রচনা:

(ক) নিম্নোক্ত তিনখানি বই-এর ভূমিকা:

Histoire de Douze Heures, লেখক পি. জে. বোনজিয়া, আগস্ট ১৯২১ (রাইডার সম্পাদিত); Sous le Pressoir লেখক এইচ. হ্যাডেল (Soc-Mutuelle d' Edition);

Le Petit Jean, লেখক ফেডেরিক ভানে এডেন, ১৯২১ (সম্পাদক রাইডার);

(খ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'জাপানের তরুণদের প্রতি বাণী', ১২ই আগস্ট, ১৯২১;

(গ) জুর্নাল দ্যু পোপল পত্রিকায় লিখিত কতকগুলি চিঠি: ফেবারের বহিষ্কার সম্পর্কে এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবীদলগুলির মিলনের উদ্দেশ্যে (৮ই জুলাই, ১৯২২);

রুশ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের বিচার সম্পর্কে 'বিপ্লবের মাতামহী' ক্যাথারিন প্রেস্কোভস্কায়া লিখিত পত্রের ভূমিকা! ইহাতে আমি বোলশেভিকদের বিশেষত লুনাচারস্কির নিকট হিংসা ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে আবেদন জানাইলাম;

(ঘ) নিউ ইয়র্কের নিউ স্টুডেণ্ট পত্রিকার জন্য লিখিত (২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৩) 'No res Judicata pro Veritate habeatur' নামক প্রবন্ধ—ন্যাশন্যাল স্টুডেণ্ট ফোরাম-এর তরুণ কমরেডদের জন্য উহা লিখিত। প্রচলিত মতামত সম্পর্কে সুস্থ সমালোচনার মনোবৃত্তি জাগাইয়া তোলা উহার উদ্দেশ্য;

৯। ম্যাক্স ইস্টম্যানের সহিত (১৯১৯ সালের ডিসেম্বর), জীন রিচার্ড ব্লকের সহিত (জানুয়ারী-আগস্ট, ১৯২০), (ক্ষুব্ধ হিংসার মনোবৃত্তি লইয়া ইনি "তখন মনস্বিতার সমস্ত বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করিবার" আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন); ফার্ণাণ্ড ডেসপ্রেসের সহিত, কঁং ল্যুসিদির সহিত ও অন্যান্য অনেকের সহিত (১৯২১ সালের বসন্তকাল) বিতর্ক ও পত্রবিনিময়। কারারুদ্ধ মনাৎ-এর পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধাবলী রচনা (ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সাল)।

১০। ১৯২২ সালের ১৬ই মার্চ আমি বার্লিন হইতে বিদেশে 'রুশ সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদলের' প্রতিনিধিদলের স্বাক্ষরযুক্ত দুইশত কথার একখানি সুদীর্ঘ তার পাই (এই প্রতিনিধিদল ছিল Benizinof Roubanovitch Roussanof, Soukhomeline, Tchernof লইয়া গঠিত; Gotz, Goudelmann, Timofeef, Rakow প্রমুখ ছয়জন বিখ্যাত পুরাতন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীর বিচারের ও আসন্ন দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য তাহারা প্রত্যেক স্বাধীন মানুষকে আহ্বান জানান)। আনাতোল ফ্রাঁসও অনুরূপ তার পাইয়া মস্কো সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া তার পাঠান; ইহাতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আমার মত তাহার পক্ষেও সমস্ত ব্যাপারটি ভালোভাবে বিচার করা ছিল কঠিন। কিন্তু এ'ধরনের ব্যাপারে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবেই। ফ্রান্সের সমাজতন্ত্রী বোলশেভিক-বিরোধী সংবাদপত্রগুলিতে আনন্দ শুরু হইয়া গেল।

১১। এই পত্রবিনিময়ের গভীর ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। এই পত্রবিনিময়ের মধ্যে দেখা যায় লেনিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গর্কি যেন অকস্মাৎ আলো দেখিতে পাইয়াছেন। শোকসংবাদের সাংঘাতিক আঘাতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তাহার আবেগপ্রবণ মন যেন এক মুহূর্তে লেনিনের সমস্ত চিন্তাধারাকে ও কর্মধারাকে বুঝিতে পারিল,

গ্রহণ করিতে পারিল। পূর্বে যদিও তিনি লেনিনকে ভালবাসিতেন ও প্রশংসা করিতেন তথাপি তাহার কর্মধারার সহিত বিরোধ তাহার ছিল। লেনিনের মৃত্যুতে তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, তিনি যেন বলিতে পারিলেন, "আমি দেখিলাম, আমি জানিলাম, আমি বিশ্বাস করিলাম, আমার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল।"

১২। ১৯২১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ক্লার্তে পত্রিকায় প্রকাশিত "কর্তব্যের অপরাধ: রলাঁবাদ সম্পর্কে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ হইতে রলাঁ-বারবুস বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

তারপর:

(ক) ১৯২২ সালের জানুয়ারী ব্রুসেলসের লা'র লিব্‌র পত্রিকায় প্রকাশিত আঁরি বারবুসের নিকট রমাঁ্যা রলাঁর খোলা চিঠি।

(খ) ১৯২২ সালের ১লা ফ্রেব্রুয়ারীতে 'ক্লার্তে' পত্রিকায় প্রকাশিত বারবুসের নিকট লিখিত রলাঁর দ্বিতীয় খোলা চিঠি।

(গ) ১৯২২ সালের মার্চে লা'র লিব্‌র্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত রমাঁ্যা রলাঁর 'চিন্তার স্বাধীনতার আবেদন বাণীর' প্রত্যুত্তর।

(ঘ) ১৯২২ সালের ৮ই মার্চের লা'তেরনাসিয়নাল ও ২৫শে মার্চের ল্যুমানিতে পত্রিকায় প্রকাশিত মার্সেল মার্তিনের প্রবন্ধাবলী।

(ঙ) "কমিউনিস্ট বন্ধুগণের নিকট রমাঁ্যা রলাঁর চিঠি" (লা'র লিবর্‌ এপ্রিল ১৯২২)। (লা'র লিব্‌র ছিল ব্রুসেল্‌স্‌ হইতে প্রকাশিত একখানি পত্রিকা। অপূর্ব নৈপুণ্যের সহিত পল কলাঁ্যা ইহারা সম্পাদনা করিতেন। যুদ্ধপরিবর্তী প্রথম কয়েকবৎসরে আন্তর্জাতিক আর্ট ও চিন্তাধারা সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় তাহার সংকলন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান।)

বারবুসের নিকট লিখিত রমাঁ্যা রলাঁর চিঠিগুলি ফ্রান্সে ও বিদেশের বহু সাময়িকপত্রে, বিশেষত নিউইয়র্কের দি নেশন পত্রিকায়

(৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২), Les Humbles পত্রিকায় (১৯২২ সালের মার্চ সংখ্যা) ও কং ল্যুসিদির Rassegna Internazionale পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই তর্কযুদ্ধের প্রান্তদেশে আলবার্ট ম্যাথিয়েজ ও রম্যাঁ রলাঁর মধ্যে একটি ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যায় :

(ক) এ, ম্যাথিয়েজ লিখিত The European Elite and the Terror (ক্লার্তে, ১লা জুন ১৯২২)।

(খ) রম্যাঁ রলাঁর উত্তর, এবং

(গ) ম্যাথিয়েজের প্রত্যুত্তর (ক্লার্তে, ১লা জুলাই ১৯২২)।

১৩। ১৯২২ সালের ১৮ই মার্চ মনাৎ ও মার্তিনের সহিত আমার যে আলোচনা হয় সেই আলোচনার কথা আমার ডায়েরীতে আমি লিখিয়াছি। ইহাতে কিছু মন্তব্যও আমি লিখিয়াছি যাহার ফলে বারবুসের সহিত আমার তখনকার বিতর্ক সুসম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ্য আলোচনা অপেক্ষা আরও স্বাধীনভাবে আমি এই আলোচনায় ইউরোপ সম্পর্কে আমার নৈরাশ্যের কথা স্বীকার করিলাম। এই মনোভাব প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিবার জন্য যখন আমাকে বলা হইল, আমি জবাব দিলাম, "আমার মনের গভীরে যাহা রহিয়াছে প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে নৈতিকভাবে আমি অক্ষম; কারণ জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উহা সহ্য করা কঠিন হইবে। ইহা আমি নীরব শান্তভাবে বহন করি, কারণ ইতিহাসের বহু বৃহৎ দিগন্তের সহিত আমার পরিচয় আছে। আমার দূরদৃষ্টিতে আমি যাহা দেখি তাহাতে স্বল্পদৃষ্টিতে দেখা দুর্দিনের আশঙ্কায় উপশম হয়। কিন্তু জনতা ত' বর্তমান ছাড়া আর কিছু দেখে না; অতএব বর্তমানের মধ্যেই তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এই আশ্বাস যদি কেহ তাহাদের না দেয় তবে তাহারা নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িবে।

আমি জানি বিপ্লবের মধ্য দিয়া অবিলম্বে ইউরোপের সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের যে-দিবাস্বপ্ন তাহারা দেখিতেছে তাহা সফল হইবে না; আমি জানি মুষ্টিমেয় কবলিত সাম্রাজ্যবাদের এই সবে সূচনা। এ-কথা আমি তাহাদের বলিতে পারি না এবং এ-সম্পর্কে মিথ্যাও বলিতে পারি না। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে, আমার বিশ্বাসই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু (ইউরোপের) জনতার এই বিশ্বাসের বল নাই। এই বিশ্বাসের বীজ তাহাদের বুকে পুঁতিয়া দেওয়াই আমার কাজ। কিন্তু এখন হইতে ফসল পাকা পর্যন্ত যে কাজ সে দীর্ঘদিনের কাজ।"

আজ যখন এই কথাগুলি আবার পড়ি তখন এ-কথা বলিতে পারি না যে, আমার সেদিনের সে-নৈরাশ্যের কোনো ভিত্তি ছিল না; কারণ ইউরোপের পরবর্তী ঘটনাবলীই তাহার প্রমাণ দিয়াছে। কিন্তু এই নৈরাশ্য কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইবার কারণ হইতে পারে না; পরন্তু ইহাই কর্মক্ষেত্রে থাকিবার কারণ। এই জনতাকে নাড়া দেওয়া দরকার। যে-সামাজিক বিশ্বাস আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সেই বিশ্বাসের বীজ ছড়াইতে হইবে এই জনতার জমি চষিয়া তাহার বুকে। তখন দেহে মনে গভীর অবসাদ লইয়া আমি দিন কাটাইতেছি। আগেই বলিয়াছি, যুদ্ধপরবর্তীকালের ফরাসীদের মধ্যে এই অবসাদ তখন সাধারণভাবেই দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে অতিরিক্ত শক্তিব্যয় ও শান্তির মধ্যে বিপুল আশাভঙ্গের সহজ স্বাভাবিক পরিণতিই এই অবসাদ।

আমার প্রশ্নকারীদ্বয় মনাৎ ও মার্তিনে তখন যে-কোনো উপায়ে বিপ্লবকে বাঁচাইবার জন্য ইস্পাতকঠিন সংকল্প লইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন; কারণ, বিপ্লবকে বাঁচানো তখন তাহাদের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নৈরাশ্য তাহাদেরও কম

দেখা গেল না, সম্ভবত এ-নৈরাশ্য আমার চেয়ে তাহাদের নিকট আরও বেশি ব্যথার বস্তু। আমি লিখিলাম : আজিকার যে ট্রাজেডি, যে ট্রাজেডি তাহাদের মনের উপর জগদ্দল পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছে, রসনাকে বাঁধিয়াছে নানাভাবে, সে ট্রাজেডি আর কিছুই নহে—তাহারা যেন বুঝিতে পারিতেছেন রুশবিপ্লবের ধ্বংস প্রায় সুনিশ্চিত। তাহাদের চোখে জেনোয়া সম্মেলন দ্বিতীয় ব্রেস্ট-লিটভ্‌স্কের রূপ ধরিয়া আসিতেছে; ইউরোপের শক্তিগুলি রাশিয়ার উপর আবার যে শোচনীয় সন্ধি চাপাইতে চলিয়াছে তাহা রোধ করিবার শক্তি যেন রাশিয়ার নাই। এই বিপর্যয় যতই কাছে আসিতেছে ততই ইউরোপের সোশিয়ালিস্ট ও এনার্কিস্ট পত্রিকাগুলিতে বিপ্লবের উপর আক্রমণ তীব্র হইতেছে। আজ বহু সোশিয়ালিস্ট সাময়িক পত্রিকায় রুশবিপ্লবের বিরুদ্ধে যতটা বিষোদ্গার করা হইতেছে বুর্জোয়া পত্রিকাগুলিতেও ততটা হইতেছে না। প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নমেন্টের নিকট ইহা এতই মুখ-রোচক যে মনাৎ এমন সন্দেহও প্রকাশ করিলেন যে, এই বিপ্লব-বিরোধিতাকে গভর্নমেন্ট গোপনভাবে সাহায্য করিতেছে। মনাৎ ও মার্তিনে নিবিড় ঘৃণার সহিত ফ্রান্সের মজুরশ্রেণীর উল্লেখ করিলেন। বলিলেন, বিপ্লবের জন্য তাহারা কিছু করে নাই, কিছু করিতে চাহেও না; তাহারা সহজেই আত্মবিক্রয় করিয়াছে কিংবা ঘুম পাড়াইতে আসিলেই ভীরুর মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এবং এই ভীরুতাকে তাহারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খোলশ দিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে। আমার বন্ধুরা বলিলেন যে, ফরাসীদের মত যখন কোনো জাতি এতখানি ঘৃণ্য স্বার্থপরতা দেখায় তখন রুশবিপ্লবকে নিন্দা করিবার অধিকার আর তাহাদের থাকে না। সেই অতি-মানবীয় উদ্যম সম্পর্কে বিচারবাণী উচ্চারণ করিবার কোনো অধিকার

তাহাদের নাই, অধিকার আছে শুধু নীরব থাকিবার।

আর ইহার সহিত আমি যোগ করিলাম: "আমার সঙ্গীদ্বয়ের বেদনা আমি বুঝি। জনসাধারণের অভিজ্ঞতা তাহারা অর্জন করিয়াছেন, এ-অভিজ্ঞতা ভীষণ হতাশার অভিজ্ঞতা। বিপ্লবের মত জনসাধারণের মধ্যে মাত্র একটি বিশেষ মুহূর্তের জন্যই যে বীরত্বের উদ্দীপনা আসে সে-বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য নাই। অবিলম্বে ইহাকে কাজে লাগাইতে হইবে। কারণ এ-মুহূর্ত একবার হারাইলে সবই যাইবে। তরঙ্গ সরিয়া যাইবে। একদিন আবার এই তরঙ্গ উঠিয়া আসিবে। কিন্তু যে-মানুষ অবিচলিত প্রত্যয়নিষ্ঠ—সে হাল ছাড়ে না; তরঙ্গের পুনরাবির্ভাবের জন্য নির্নিমেষ সতর্কতায় অপেক্ষা করিয়া থাকে!" (যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী কয়েক বৎসরের ব্যক্তিগত ডায়েরী, ৩২ খণ্ড)।

১৪। হেনরি ভান ডের ভেল্ডেই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি নীতির দিক হইতে বিপ্লবের নিন্দা না করিয়া প্রকৃতপক্ষে উহাকে বর্জন করেন এবং বলেন, "স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ধ্বংস ও মজুরশ্রেণীর স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদির ফলে রাশিয়ায় সাম্যবাদ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।"

১৫। "আমার নিজের সম্বন্ধে—সহজ, স্বতন্ত্র একটি মানুষের সম্বন্ধে আমি গান গাই,

তবু বলি গণতন্ত্র, জনসাধারণ!" ওয়াল্ট হুইটম্যান্

১৬। ক্লার্তে পত্রিকায় "দি ইউরোপীয়ান এলিট এণ্ড দি টেরর" নামক প্রবন্ধে আলবের মাতিয়েজ বিনা কারণেই আমাকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন (১ লা জুন, ১৯২৪); ভাষায়ও খুব সংযম দেখাইলেন না। আমার বিরুদ্ধে তিনি নিক্ষেপ করিলেন ইতিহাস হইতে আহরিত বজ্র; উত্তর আমাকে দিতে হইল ফরাসী বিপ্লব

সম্পর্কে (ক্লার্তে, ১লা জুলাই, ১৯২২)। বিষয়টি ছিল ১৭৯৩ সালের বিপ্লবের সহিত ওয়াড্সওয়ার্থ, কোলরিজ, শিলার, ক্লপস্টক প্রমুখ অগ্রগত ইউরোপের বুদ্ধিজীবীগণের বিচ্ছেদ ; কন্ভেনশনের নেতাগণ বুদ্ধিজীবীগণের প্রতিক্রিয়াকে গণনার মধ্যে না আনিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, সেই ভুল না করিবার জন্য আমি আমার সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুগণকে উপদেশ দিয়াছিলাম।

অনেক বেশি সহনশীলতার সুরে আমেদে দ্যুনোয়া ব্যক্তিস্বাধীনতার যোদ্ধাগণকে মজুরবাহিনীতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। (ল্যুমানিতে, ১০ই মার্চ, ১৯২২, "কমিউনিস্ট ইশ্তেহার সম্পর্কে")। এবার তিনি নির্ভুল পথ ধরিলেন। তিনি ইহাও বলিতে পারিতেন —অভিজ্ঞতা হইতে ইহার সত্যতা আজ আমি উপলব্ধি করিয়াছি, যে আদর্শের জন্য মজুরশ্রেণী সংগ্রাম করিতেছে তাহার বাহিরে যে কোনোরূপ 'স্বাধীনতা'ই আলেয়ার আলো। কিন্তু সেদিন তাহার আহ্বানের জবাবে আমি লিখিয়াছিলাম (১০ই মার্চ): "যখনই মজুরশ্রেণী সত্য ও মানবতাকে সম্মান করিয়া চলিবে তখন তাহার সাথে আছি! যখনই সে উহাদের অসম্মান করিবে তখনই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব।"

১৭। বিখ্যাত উদ্যানবিজ্ঞানী মিচুরিনের নামে কোজ্লভ শহর ও জেলার নামকরণ হইয়াছে, আর মানবহৃদয়মালঞ্চের সদাপ্রফুল্ল মালাকর ম্যাক্সিম গর্কির নাম পাইয়াছে নিজ্নি নভোগোরোদ। ইহার উপর পামিরের উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়া ও শহরগুলির কথা ত' ছাড়িয়াই দিলাম ; লেনিন, স্টালিন প্রমুখ বিরাট সমাজস্রষ্টা বীরগণের নামে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে।

১৮। ১৯২১ সালের ২০শে ডিসেম্বর গর্কির কাছে আমি বারবুসের নিকট লিখিত আমার প্রথম পত্রখানি পাঠাইয়াছিলাম। স্যাঁ ব্লাজিয়ঁ

হইতে ১৯২২ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে গর্কি নিম্নলিখিত উত্তর পাঠান :

"বারবুসের নিকট লিখিত আপনার পত্রখানি চমৎকার এবং আপনার ও আমার চিন্তার সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে দেখিয়া আমি যে কত খুশি হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার ভাবধারাকে আমি ভালোবাসি ও মূল্যবান বলিয়া মনে করি ; গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার নিজের দেশে উহা অবিশ্রাম বলিয়া আসিতেছি।"

২৫শে জানুয়ারী তারিখে তিনি লিখিলেন :

"বারবুসের নিকট আপনি যে পত্র লিখিয়াছেন আমার মতে তাহার মূল বক্তব্য : লক্ষ্য পবিত্র হইলে যে-কোনো উপায়ই পবিত্র—এই নীতির সমালোচনা। লক্ষ্য কি ? এমন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা যাহার মধ্যে মানুষ সৎ, শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও ন্যায়বান হইতে পারে। বিপ্লবের সূচনাকাল হইতেই রাশিয়ায় আমার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে আমি সংগ্রামকালে নৈতিক শুচিতা রক্ষার কথা বলিয়া আসিতেছি। লোকে আমাকে জানাইয়াছে, ইহা নিবু'দ্ধিতা, অসম্ভব, এমন কি ক্ষতিকর। যাহারা এই জবাব আমাকে দিয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই নিজেদের অনুসৃত নীতির প্রতি একটা প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু নিজেদের স্বভাবের বিরোধিতা করিয়াও ইচ্ছা করিয়াই হিংসাকে বরণ করিয়াছেন। ইহারা সেই গোঁড়া ধার্মিকদলের লোক যাহারা "অপরের মুক্তির জন্য নিজেরা পাপ করে।"

"হায়! আমি আজ পর্যন্ত দেখিলাম না ইহা কাহাকেও বাঁচাইতে পারিয়াছে, অথবা কাহাকেও বা কোনো জিনিসকে বাঁচাইতে পারিবে অথচ, ধর্মান্ধদের কাহাকেও ত' টিকিতে দেখিলাম না ; বিদ্রোহী বিবেকের দংশনে ও দ্বিধাবিদীর্ণ মনের যন্ত্রণায় দুর্বল বা অবসন্ন হইয়া তাহারা শেষ হইয়া গেল। প্রিয় রলাঁ, বারবুসের নিকট লিখিত পত্রে

জাংউইল প্রমুখ বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখকগণের সহিত আমার পরিচয় হয়।

২২। ১৯২১ সালের ১লা মে লণ্ডনে পি-ই-এন ক্লাবের যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, সেখানে সম্মেলনের পূর্বাহ্নে বেলজিয়াম দলের বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগে জার্মান জাতিকে সম্মেলন হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। আমি সেখানে অন্যান্য জাতির সহিত জার্মানীর সহযোগিতার দাবী জানাই এবং একটি বিবরণীতে বেলজিয়ম দলের মনোভাবের খোলাখুলিভাবে তীব্র নিন্দা করি। বিবরণীটি ১৯২৩ সালের ১৫ই জুন ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দুর্গত জার্মানদের জন্য একটি আবেদন বাহির করি। উহা ইউরোপ ও লিব্‌র্ প্রোপো পত্রিকায় ১৯২৪ সালের ১২ই ও ১৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় বাহির হয়। পারীর বড় কাগজগুলির মধ্যে একমাত্র এ্যর নুভেল-এই উহা প্রকাশিত হয়। এই আবেদনে যে-সাড়া পাই তাহা সত্যই বলিবার মত। একদিন এ-কাহিনী যখন প্রকাশিত হইবে, তখন লোকে অবাক হইয়া শুনিবে যে, স্বাধীন বলিয়া সুখ্যাত বহুলোক কেহবা প্রকাশ্যে, কেহবা পরোক্ষে, কেহবা কাপুরুষের মত এই আবেদনে সাড়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সেকুর আঁতেরনাসিয়নাল ও জ্যাঁফাঁ-র ফরসী কমিটিকে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফাদার লিয়ঁ বেরনার ও ফাদার কালামেৎ-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে হইয়াছিল একমাত্র এই কারণে যে, কমিটি আমার আবেদনটি প্রকাশ করিয়াছিল এবং চরম দুর্দশাগ্রস্ত জার্মান শিশুদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিল। যে সম্প্রদায় নিজেদের প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান বলিয়া পরিচয় দেয়, এই একান্ত মানবসেবামূলক আবেদনের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত লজ্জাজনক। (১৯২৪ সালের মার্চ মাসের য়ুনিভের্সেল

পত্রিকায় ডাঃ দ্যমেসিলে-এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। (ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ড হইতে এ-সম্পর্কে যেসকল অপমানকর চিঠি পাইয়াছিলাম তাহার উল্লেখ এখানে করিলাম না। সেগুলি ফাইলে আছে।)

২৩। রুর-এর বিজয়ীদের আশু উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, যে-নীতি তাহারা অনুসরণ করিতেছেন কিছুকাল পরে তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে। ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধিবে দ্বিগুণ ঘৃণা লইয়া এবং সে-যুদ্ধে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইবে। নির্যাতিতকে যতখানি অনুকম্পা করি ততখানি অনুকম্পা করি নির্যাতনকারীকেও। তাহারা তাহাদের সন্তানসন্ততিগণের জন্য ভীষণ এক ভবিষ্যতের সৃষ্টি করিতেছে। (কঁৎ ল্যুসিদি সম্পাদিত রাসেনা ইস্তেরনাৎসিওনাল-এ ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে লিখিত)।

ইহার অনেক পরে বের্নার লকাশকে লিখিয়াছিলাম : "যখন 'শান্তির' (?) সন্ধি ইউরোপের সর্বত্র যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, মিলিতদের বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং বিচ্ছিন্নদের সম্মিলিত করিয়া, তখন একনায়কত্বের (dictatorship) অভ্যুদয় যদি হয়, তাহাতে আশ্চর্য হইব না। বিজয়ী ফ্রান্স যে-গাছ নিজের হাতে পুঁতিয়াছে ইহা তাহারই ফল।" (ল্য ক্রি দে প্যেপ্‌ল পত্রিকায় ১৯২৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত)।

২৪। ১৯২৪ সালের ৬ই মার্চ প্রিমো দে রিভেরার সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত মিগেল দে উনামুনো-র পক্ষ হইতে প্রতিবাদ (১৯২৪ সালের মার্চে ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)। ১৯২৪ সালের ৩০শে নভেম্বর "ব্যাভেরিয়ান দুর্গের রাজনৈতিক বন্দীদিগের পক্ষ হইতে জার্মানীর নিকট আবেদন।"

২৫। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লিখিত, ১৫ই জানুয়ারী ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত : "ইউরোপীয় পাঠকের প্রতি নিবেদন।"

"সমসাময়িক ভারতবর্ষের কর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী ;

তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড, রামকৃষ্ণের জীবনী; ২য় খণ্ড, বিবেকানন্দের জীবনী; ৩য় খণ্ড, সার্বজনীন ভগবদ্‌বাণী; ১৯২৯ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বরে লিব্রারি স্তক-এ প্রকাশিত হয়।

২৬। আমার সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকখানি যখন গান্ধীকে পাঠাই তখন এই আশঙ্কা ব্যক্ত করি যে, তাহার চিন্তাধারা আমি সবস্থানে হয় ত' বুঝি নাই; যদি কোনো ভুল হইয়া থাকে তিনি দেখাইয়া দিলে আমি সংশোধন করিতে চাই। রোগমুক্তির পর যে-স্বাস্থ্যনিবাসে তিনি বিশ্রাম লইতেছিলেন সেখান হইতে গান্ধী লিখিলেন:

আন্ধেরি, ২২শে মার্চ, ১৯২৪

প্রিয় বন্ধু,

আপনার অনুগ্রহপত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনার প্রবন্ধে যদি আপনি এখানে-সেখানে দু'একটা ভুল করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কি আসে যায়! আমি এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইতেছি যে, এত কম ভুল আপনি করিলেন কেমন করিয়া এবং কেমন করিয়া এতদূরে, এত ভিন্ন আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া আমার ভাবধারার এত নির্ভুল ব্যখ্যা আপনি করিলেন। ইহাতে আবার প্রমাণিত হইল যে, বিভিন্ন দেশে তাহার ঠিকানা হইলেও মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে···

এম. কে. জি

২৭। প্রবন্ধ সংকলনের মধ্যে ইজভেস্তিয়ার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা ডব্লু. জে. পান্‌স্কি-সল্‌স্কিকে লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য।

সেক্‌স্‌পীয়রের 'Coriolanus' নাটকের শেষের সাত লাইন আমি ইজভেস্তিয়ায় তার করিয়া পাঠাইলাম:

I am struck into sorrow......Take him up
Help, three o' the chiefest soldiers ; I will be one
Beat thou the drum, that it speak mornfully :
Trail your steel pikes ! Though in this city
He hath widowed and unchilded many a one...
Which to this hour bewail the injury,
Yet he shall have a noble memory......

পরে লেনিনের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'লেনিন, শিল্প ও কর্ম' নাম দিয়া লেনিন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখি। ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইউরোপ পত্রিকায় উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

২৮। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে মস্কোর স্টেট একাডেমি অব সায়েন্সেস এণ্ড আর্টস ইউরোপের বিপ্লবী শিল্পের একটি প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন করিতেছিলেন (সাহিত্যিক রচনা, ছবি, নাটক, গান, নাচ, সিনেমা ইত্যাদি)। প্রদর্শনীসমিতির সভাপতি পি. কোগানের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্রে তাহারা পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার আর্টিস্টগণকে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেন।

২৯। স্বাতন্ত্র্যবাদের মরুভূমির মধ্যে মার্ক সংগ্রাম করিতেছিল। কেমন করিয়া ইহা ঘটিল ? কাল পর্যন্তও যখন যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছিল তখনও ইহা ছিল স্বাধীন আত্মার মরূদ্যান ; তখনও ছিল ঝরণার স্বচ্ছ জল, আর খর্জুরবৃক্ষতলে পরিষ্কার রাত্রি। আজ ঝরণার জল বিষাক্ত ও কর্দমাক্ত, খর্জুরবৃক্ষের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আকাশ ধূসর, বাতাসে আগুনের হল্‌কা। মরুভূমি তাহার লোলজিহ্বা মেলিয়া সব কিছু মুছিয়া খাইয়াছে।

সোজা, স্পষ্ট ভাষায় বলি। ইহাদের আত্মসমর্পণের চিত্রকে ঢাকিবার চেষ্টা করা এই কাপুরুষদের বেশি সম্মান দেখানো কারণ, আত্মসমর্পণ

ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন মন এ আর নহে। ইহা আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার কি আর বাকী আছে? ইহার পতাকার কিছু ছিন্নঅংশ পকেটে লুকানো রহিয়াছে, ছোটখাট ব্যাপারে তাহা বাহির করিয়া দেখাইতেছে। রাষ্ট্রের, রাষ্ট্রচালকদের, জনমতের ও সংবাদপত্রের বিরোধিতা করিবার সাহস কাহার আছে? বেষ্টনীর মধ্য হইতে তাহারা নিজেদের স্বাধীন বলিয়া জাহির করিতেছে। চোরেদের মত বড় বড় কাব্যের বুলি আওড়াইয়া তাহারা তাহাদের নিজেদের বাগানের কাজ লইয়া আছে। নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে কুণ্ডলী পাকাইয়া হোরেস আগামী বংশধরদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়াছেন এ-কথা গর্বের সহিত স্বীকার করিবার মত একটা নৈরাশ্যবাদ তাহার ছিল। কিন্তু অপরসকলে আমাদের এ-কথা বিশ্বাস করিতে বলে যে, তাহারা স্বাধীন, যদিও প্রভুর দেওয়া রুটিতেই তাহারা খুন্নিবৃত্তি করিতেছে। এই দাম্ভিক বুদ্ধিজীবীর দল ও তাহাদের প্রভুদের মধ্যে যেন একটি গোপন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে (প্রভুর পরিবর্তন হয়, দাসত্বের হয় না)। এ-চুক্তি গৃহস্থের সহিত গৃহপালিত পশুর চুক্তি। "যতক্ষণ তুমি আমার কাজ করিবে, যতক্ষণ আমার গোলাবাড়ি পাহারা দিবে, ততক্ষণ তোমার সর্বপ্রকারের স্বাধীনতা থাকিবে। কিন্তু চলিয়া যাইও না, যদি কথা শোন তবে আমি তোমাকে খাওয়াইয়া মোটা করিব।" তাহারা ইহাতে এত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, চলিয়া যাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করে না। প্রভু যখন তাহাদের বাড়ির বাহিরে পাঠান তখন সে বিচলিত হয় না, কারণ গলায় তাহাদের কলার রহিয়াছে। কেহ কেহ কলার ফেলিয়া দিয়া কলারমুক্ত গলা সকলকেই দেখাইয়া বেড়ান বটে, কিন্তু কলারের দাগ ত' ঢাকিতে পারেন না।

মার্ক যখন দেখিল যে-প্রভুদের সে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে এবং যে-অগ্রজদের উপর সে নির্ভর করিয়া আসিতেছে তাহাদের মন ও বুদ্ধির চরম আত্মসমর্পণকে তাহারা স্বাধীন নির্বাচনের অজুহাতে ঢাকিতে চাহিতেছেন, তখন তাহার আর লজ্জার অবধি রহিল না। সে দেখিল এই আত্মসমর্পণ করিয়াছে কেহবা স্বেচ্ছায়, কেহবা ভয়ে। অগ্রজদের এই অধঃপতন অনুজদেরও স্পর্শ করিল; অল্পবয়সেই তাহারা বুদ্ধির গণিকাবৃত্তির জন্য শিক্ষিত হইয়া উঠিল। নিলামের সর্বোচ্চ ডাক যাহার তাহার কাছেই তাহারা আত্মবিক্রয় করিল। চিন্তার স্বাধীনতা......কোথায় সে স্বাধীনতা?

মার্ক ভাবিল ইহাদের চেয়ে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা ভাল; যে ছুরি একদিন তাহার বুকে বসিবে সেই ছুরির মতই তাহারা খোলা ও পরিষ্কার।

৩০। ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে কার্ল রাডেক সোভিয়েট লেখক কংগ্রেসে "বর্তমান বিশ্বসাহিত্য ও প্রলেটারিয়ান আর্ট" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। (ইণ্টারন্যাসানাল প্রেস করেসপণ্ডেস, ৮৩-৮৪ সংখ্যা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)।

"আমরা কেবল রমঁ্যা রলাঁর নূতন মতবাদ গ্রহণ দেখিলাম না। জগত সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা তাহাকে যেমন অসম্ভব অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল, দেখিলাম তাঁহার নায়িকাকেও তিনি সেই অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। লা'ম আঁশাতে পুস্তকের প্রথম কয়েক পর্বে কাহিনী ব্যাহত হইয়াছে, কারণ কাহিনীকে কিভাবে অব্যাহত রাখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন না। এই লেখকের এখন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে? তাই কাহিনীও তাহার সত্য ঐতিহাসিক রূপ খুঁজিয়া পাইয়াছে। উপন্যাসের শেষ পর্বে নায়িকা তাই সংগ্রামের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

৩১। "ইউরোপের যে-সকল আন্তরিক লেখকগণ সংগ্রামে যোগদান করা সম্পর্কে মন স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাদের জবাব দিয়াছে ইতিহাস। ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের স্কোয়ারে স্কোয়ারে জার্মান ফাশিস্টরা যে-সকল বই পোড়াইয়া বহ্নুৎসব করে সেগুলি কেবল স্টালিন, গর্কি অথবা রেনের মত জার্মান মজুরদের লেখা বই নহে; সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত মানবপ্রেমিক লেখকদের রচনাও উহাদের মধ্যে ছিল। ইতিহাসের প্রাঙ্গনে আজ যে-সংগ্রাম শুরু হইয়াছে নিরপেক্ষতা সেখানে আর সম্ভব নহে।"

৩২। এই কয় বৎসরে সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে আমার রচনা :

(ক) "মরক্কো যুদ্ধ ও ফরাসী সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে," ১৫ই জুন, ১৯২৫;

(খ) "ইন্দোচীনের ছাত্র ও শ্রমিকদের নিকট চিঠি," ১৭ই মে, ১৯২৬;

(গ) "যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী কর্তৃক নাইকারাগুয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ", ১১ই জানুয়ারী, ১৯২৭। এ. পি. আর. এ (United Print of Mannual and Intellectual Workers of Latin America) কর্তৃক সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় বিতরিত।

(ঘ) "সাক্কো ও ভানৎসেত্তি-র সমর্থন" (১৯২৬ সালের ২৪শে আগস্ট মাসে লুসিয়াঁ প্রিস-এর নিকট লিখিত চিঠি, ২৮শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের নেশন-এ ও ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।)

(ঙ) "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাণী", ১৬ই মে, ১৯৩১।"

৩৩। ইহা ছাড়া পল বঁকুর সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমারই উদ্যোগে শুরু হয় এবং ১৯২৭ সালের ১৫ই এপ্রিল "এই স্বৈরতান্ত্রিক আইন মানিব না" বলিয়া আমার পণ প্রকাশিত হয় (১৫ই মে, ইউরোপ পত্রিকায় প্রকাশিত)। যদিও ১৯২৭ সালের ৭ই মার্চ

ফরাসী পরিষদ কর্তৃক উহা গৃহীত হয় তথাপি এই জনমত জাগরণের ফলে উহা প্রত্যাহৃত হয়।

একই কারণে ও একই সময়ে ইতালীর বিখ্যাত ফাশিস্টবিরোধী নেতা জি. সালভেমিনিকে আমি জানাই যে, "ডেমোক্রাটিক ইণ্টারন্যাশনাল লীগ অব ফ্রেণ্ডস অব ইটালিয়ান লিবার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিতে আমি যোগদান করিতে পারিব না; কারণ 'ফাশিজম্' ও 'কমিউনিজম্' উভয়কেই সমানভাবে বাধা দিবার জন্য একটি 'তৃতীয় আন্দোলন' চালনাই ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। (২৪শে মে, ১৯২৭)।

সালভেমিনিকে আমি লিখিলাম: "পূর্ব হইতেই কমিউনিজম্-বিরোধিতার ঘোষণাকে আমি অনুমোদন করিতে পারি না।" যদিও আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না তথাপি তাহাকে জানাইলাম, "কমিউ-নিজমের মধ্যে আমি একটি নূতন গভীর গণশক্তির সন্ধান পাইতেছি; ফাশিজমের বিরুদ্ধে অভিযানে ইহাই হইবে সর্বাধিক শক্তিমান বাহিনী-গুলির অন্যতম। অতএব, ইতালীর ফাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ইহার সহযোগিতা প্রত্যাহারকে আমি অত্যন্ত শোচনীয় মনে করি।"

৩৪। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাহিরে যে স্বল্পসংখ্যক বিখ্যাত ফরাসী লেখক এই সংকটমুহূর্তে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি ঘোষণা করিয়াছিলেন—আমি তাহাদের অন্যতম। মস্কোর সংবাদপত্রগুলিতে আমার চিঠি প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর ল্যুমানিতে পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। ৬ই নভেম্বর ইভরি-র এক প্রকাশ্য জনসভায় কাচিন উহা পাঠ করেন। ইহাতে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। বিপ্লবী এনার্কিস্ট মঃ ল্যাজারেভিচ্ পারী হইতে লিখিত একখানি চিঠিতে বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আমি ১৬ই নভেম্বর তাহার পত্রের

জবাব দিলাম এবং নির্বাসিত ইতালীয় ডেপুটি গিদো মিলিওলির সদ্যপ্রকাশিত দি সোভিয়েট ভিলেজ নামক পুস্তকখানিকে প্রামাণিক হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার অভিযোগের জবাব দিলাম।

"ইউরোপ ও আমেরিকার গভর্নমেণ্টগুলির সমস্ত অপকৌশলের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনসাধারণকে আমি রক্ষা করিব। আমি বুঝি না এ ব্যাপার কেন সকল স্বাধীন ব্যক্তিরা তাহাদের নিজেদের দুঃখ-বেদনাকে চাপিয়া যান না। ইউনাইটেড ফ্রণ্ট! দশ বছর আগে যেদিন শিকল ভাঙ্গিয়াছিল, সেদিনের বার্ষিকী উৎসবে যখন আমি যোগ দিই তখন সোভিয়েটের কোন নেতা আর কোন নেতার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা আমি ভাবি না। আমি শুধু মনে রাখি, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে, বাস্তীয়্ ভাঙ্গিয়াছে। "এখন তোমাদের কর্তব্য এ-কাজ সুসম্পন্ন করা (আমার নাটক The 14th of July-এর শেষে কামীয়্ দেলঁ্যা যেমন জনগণের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন), "প্রারম্ভকাল শেষ কর! এক বাস্তীয়্ ভাঙ্গিয়াছে; আরও বাস্তীয়্ রহিয়াছে; আক্রমণে আগাইয়া যাও।"

৩৫। চার বৎসরে (১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে 'রুশ ভ্রাতাগণের প্রতি' শীর্ষক ভাষণের পর) ফরাসী জনমতের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। জনসাধারণের সমক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রকাশিত হওয়ায় ও মস্কোতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত টেক্‌নিশিয়ানদের বিচারের ফলে ইউরোপের প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর অন্তরে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

এই চাঞ্চল্যকর বিচারের ফলে স্পষ্ট দেখা গেল যে-মজুরশ্রেণী হইতে তাহারা আসিয়াছে তাহারই প্রতি, একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টমনা কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষেই আর নিরপেক্ষ থাকা চলে না! ১৯৩১

সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভকস্ পত্রিকায় আমি লিখিলাম : "এইটুকু আপনাদের বলিতে পারি, আমি আর একা নই ; ইউরোপের অনেকেই আমার পক্ষে আসিতেছেন। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় ইউরোপের বহু সুস্থবিবেকই গভীরভাবে আলোড়িত ; আত্মবিক্রীত সংবাদপত্রগুলিতে অবশ্য ইহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আমার মধ্যে এক নূতন ইউরোপের অভ্যুদয়কে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। এই ইউরোপ আপনাদের দিকে আগাইয়া যাইতেছে।"

৩৬। আমি প্রায়ই বিরোচিত শক্তিমান অবাধ্যতার (disobedience) সমর্থন ও প্রচার করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই ইহা ফলপ্রদ নহে, এমন কি ইউরোপে ইহার একটি গৌরবময় অতীত রহিয়াছে। (১৯০০ সালের ১৪ই জুলাই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' সম্পর্কে চিঠি।) কিন্তু এই মহান অস্বীকৃতির পথ যাহারা গ্রহণ করেন তাহারা ত্যাগ ও দুঃখবরণের দুরূহ কর্তব্যও সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। আমি আইনস্টাইন ও ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশন্যাল হইতে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিলাম। ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশন্যাল তখন আইনস্টাইনের ঘোষণাবাণীটি গ্রহণ করিয়াছে। কোনোরূপ বিপদের ঝুঁকি না লইয়া কেবলমাত্র সহজ ব্যক্তিগত অস্বীকৃতির দ্বারাই পৃথিবীতে যুদ্ধের বিলোপ ঘটানো চলিতে পারে, তাহাদের এই বিপজ্জনক শিশুসুলভ আশাবাদ যে কতবড় বিভ্রান্তির তাহা আমি তাহাদের জানাইয়া দিই। (১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী ওআর রেসিস্টারস্ ইণ্টারনেশনেশন্যাল-এর সেক্রেটারী রানহ্যাম্ ব্রাউনের সহিত পত্রবিনিময়)

৩৭। ইণ্টারনেশন্যাল প্যাসিফিস্ট নামে এউজেন রেলজিস একখানা বই লিখিয়াছেন। ১৯২৯ সালে ফ্রান্সে আঁদ্রে দেলপেশ কর্তৃক উহা প্রকাশিত হয়। ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে অস্ট্রিয়ার মুনৎসেনবের্গ-এ

অনুষ্ঠিত লা'তেরনাসিয়নাল দে রেজিস্তঁা আলাগের-এর এক সম্মেলনে তিনি যাহা বলেন এই পুস্তকে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত করেন। এই উপলক্ষে প্রেরিত আমার একখানি চিঠি ও একটি বাণী তিনি তাহার পুস্তকে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে তিনি যে ইউরোপীয় তদন্ত পরিচালনা করেন আমি তাহার একখানি দীর্ঘ জবাব দিই; সেটি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জানি না। সমাজসংগ্রাম ও শ্রমজীবীশ্রেণীকে ছোট করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত মসীকৌলিন্যাভিমানী বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বাস্তবসংস্পর্শহীন শান্তিবাদের নিকট এই জবাবের গুরুত্ব অন্যপ্রকারের, অস্বস্তিকরও।

৩৮। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে আমস্টার্ডম কংগ্রেসে ৩০,০০০ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ২,০২০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। ঐ ৩০,০০০ প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৩০,০০০,০০০। ১৯৩২ সালের ১৫ই অক্টোবর ইউরোপ পত্রিকায় আমি ঐ সম্মেলনের একটি রিপোর্ট দিই।

২৭শে আগস্ট প্রথম অধিবেশনে পঠিত আমার বাণীর মধ্যে আমি বলি: "আমাদের প্রত্যেকের, প্রত্যেক দলের, নিজেদের অস্ত্র, নিজেদের কৌশল রহিয়াছে। সকল আন্তরিক ত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষাকে আসুন আমরা একত্রিত করি। লক্ষ্য যদি এক হয় তবে সাধারণ কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই বহু স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত কাজ চলিতে পারে। মজুরবাহিনী যে শত্রুর বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ চালাইতেছে, বিবেকের নির্দেশে আদেশ অমান্য করাও সেই শত্রুর দুর্গপ্রাকারেই আঘাত করা হয়। ব্যক্তিগত শক্তির আনুসঙ্গিক প্রয়োগ গণসংগ্রামকে ব্যহত করে না, শক্তিশালী করে। যে-বাহিনীর রণাঙ্গন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া, সাধারণভাবে সমস্ত রণাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক বিভিন্ন ফ্রণ্টেরই কর্মের স্বাধীনতা রহিয়াছে।"

যদিও অস্থায়ী আমস্টার্ডম ইশ্‌তেহার (যাহা রচনায় আমার কোনো হাত ছিল না) বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতার উপর আমি যতটা দাবী করিয়াছিলাম ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। (যদিও আমি শ্রদ্ধার সহিত ইহার উল্লেখ করিয়াছিলাম) আমি দ্বিগুণভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলাম (১৯৩২ সালের ১০ই ডিসেম্বর, বারবুসের নিকট লিখিত পত্র) এবং ১৯৩২ সালের শেষভাগে ইশ্‌তেহার প্রণয়ন হইবার সময় যে আলোচনা হয় তাহাতে শ্রমিক বিপ্লব ও বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধিতা এই দু'এর সহযোগিতাকে আমি নীতি হিসাবে গ্রহণ করাইতে সক্ষম হই।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য গঠিত ইণ্টারনেশন্যাল বুরো অব ওআর্লড্‌ কমিটি-র পারী-তে যে দ্বিতীয় অধিবেশন হয় (১৯২৩ সালের ২১-২৩ ডিসেম্বর) তাহাতে "Declaration on the Participation of the Groups for Individual Action for Amsterdum Movement" প্রকাশিত হয়। ফরাসী, জার্মান ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টি দায়িত্ববলে সভ্যদের লইয়া গঠিত (বারবুস, কাচিন, ভিলি মুনৎসেনবের্গ, শ্‌ভের্নিক এইচ স্টাসোভা প্রভৃতি) এই বুরো "আবার স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে সমস্ত দলের উপরে ও বাহিরে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে সংকল্পবদ্ধ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ও ব্যক্তিকে সম্মিলিত করাই ইহার লক্ষ্য। আমস্টার্ডম্‌ ইশ্‌তেহারের স্থানবিশেষ লইয়া যে অমূলক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইহা ঘোষণা করিতেছে যে, বিবেকের নির্দেশে যুদ্ধবিরোধীদের মত ব্যক্তিগত সংগ্রামে বিশ্বাসী দলেরও স্থান আমাদের মধ্যে আছে, যদি তাহারা বিশ্বসম্মেলন হইতে যে প্রতিষ্ঠানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ বিনাশর্তে সহযোগিতা করিতে সম্মত হন।"

বিবেকবাদী, অহিংসাবাদী লীগ অব ফাইটার ফর পীস-এর

সভ্যদের মধ্যে (এইসময় আমি ছিলাম ইহার সভাপতি) আমি পূর্বোক্ত নীতি অনুযায়ী আন্দোলন চালাইতে লাগিলাম। (International Bureau of the Amsterdum Committee কর্তৃক নির্দিষ্ট সহযোগিতা সাধনোদ্দেশ্যে আবেদন ও পত্রাবলী দ্রষ্টব্য): ১০ই জুন, ১৯৩২, "শান্তির জন্য সংগ্রামকারিগণের নিকট আবেদন";

১২ই জুলাই, ১৯৩২, "ভিক্টর মেরিকের নিকট লিখিত পত্র";

৩১শে জুলাই ১৯৩২, International Anti-militarist Bureau-র সেক্রেটারী আলবের দ্য জঁ-এর প্রেরিত প্রতিবাদ। আমস্টার্ডম কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি চেষ্টা করিয়াছিল।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, International League of Women for Peace and Liberty-র সেক্রেটারী কামীয় দ্রেভেকে লিখিত চিঠি;"

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৩, শ্রমিক জনগণের সহিত বিবেকবাদী ও নীরব প্রতিরোধীদের মিলিতভাবে সংগ্রাম চালাইবার জন্য রেনে শিকেলের নিকট পত্র;

সর্বোপরি 'International League of the Fighters for Peace এর National Easter Congress-এর নিকট আবেদন (১৫ই মার্চ, ১৯৩৩) এবং এই আবেদনের সহিত মন্তব্য জুড়িয়া কংগ্রেসের সেক্রেটারী এ. বোসের নিকট লিখিত পত্র (১৮ই মার্চ, ১৯৩৩); জর্জ পিয়শকে লিখিত চিঠি (১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩);

১২ই জুলাই ১৯৩৩, লণ্ডনের 'No More War' আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক রেজিন্যাল্ডস্ এ. রেনল্ডস্এর নিকট লিখিত পত্র, ইত্যাদি।

এই সকল রচনার মধ্যে এমন একটি আলোচনা চোখে পড়িবে যাহাতে হিংসা ও অহিংসা এই দুই রণপদ্ধতি সম্মিলিত করিয়া 'তৃতীয় যুদ্ধের' জন্য প্রস্তুত হওয়া, এই আলোচনা যতটা বাস্তবক্ষেত্রের ব্যাপার

ততটা তত্ত্বমূলক নহে। আমার 'শান্তির জন্য যোদ্ধাদলের' বন্ধুগণ কেবলমাত্র দুই ধরনের যুদ্ধকেই জানিতেন: এক ধরনের যুদ্ধ যাহা জনসাধারণ তাহাতে প্রভুশ্রেণীর স্বার্থে যোগ দেয়; আরেক ধরনের যুদ্ধ যে-যুদ্ধে প্রভুশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থরক্ষায় অবতীর্ণ হয় বা হইয়াছে। আমি দেখাইলাম আরেকটি 'তৃতীয় যুদ্ধ' রহিয়াছে, বর্তমান অবস্থায় তাহার মত সাংঘাতিক যুদ্ধ আর হইতে পারে না: এই যুদ্ধ জনসাধারণের বিরুদ্ধে প্রভুশ্রেণীর যুদ্ধ। জার্মানীতে, ইতালীতে এবং (আজ স্পেনেও এই যুদ্ধ ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে।) ব্যাঙ্ক ও শিল্পপতিগণের অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া ফাশিজম্ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেখানেই এই যুদ্ধ চলিতেছে। অক্রমণের উদ্যোগ আর বিপ্লবের হাতে নাই। প্রকৃত বিপদ কোথায় শত্রু তাহা বুঝিতে পারিয়া অগ্রবর্তী ঘাঁটি আগলাইয়া চলিতেছে। বিপ্লবকে তাহারা প্রারম্ভেই বিনাশ করিতে চায়। (১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ)

৩৯। সংগ্রামের প্রথম দিকে হিটলারী শাসন আমার সহিত কিছুটা সংযত ব্যবহার দেখাইল। ভোর্সাই সন্ধির অবিচারের বিরুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর পক্ষ আমি চিরদিনই সমর্থন করিয়া আসিতে-ছিলাম। এই সংযত ব্যবহার হয় ত' স্মরণ করিয়াই তাহারা আশা করিয়াছিল, জাতিগত প্রভুত্বের যে পাশবিক স্বৈরশাসন জার্মানীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছিল তাহার সমর্থনে তাহারা আমার জার্মানীর প্রতি সহানুভূতিকে কাজে লাগাইতে পারিবে। এমন কি যেদিন 'হিটলারী সংগ্রামের বিরুদ্ধে সরকারী সাহায্য সমিতি' স্বাক্ষর-কারিগণের মধ্যে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়া হাজার হাজার আবেদনপত্র বিতরণ করিয়াছে, সেদিনও জার্মানীতে তাহারা এই ব্যাপার না জানিবার ভান করিয়াছে। তাহারা যেন আমায় পথভ্রান্ত বন্ধু হিসাবেই দেখিতেছে এইরূপ ভান করিল। সমস্ত ব্যাপারটা

ভালভাবে জানিয়া অভিমত ব্যক্ত করিবার জন্য তাহারা আমার নিকট আবেদন জানাইল। এমন কি তাহারা আমাকে স্বপক্ষে টানিবার চেষ্টা করিল। ১৯৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল জেনেভাতে জার্মান কন্সাল আমাকে জানাইলেন কলা ও বিজ্ঞানের জন্য গ্যয়টে-পদক আমাকে দিবার জন্য রাইখের প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবুর্গ নাকি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। উত্তরে আমি জানাইলাম যে যদিও এই সম্মান প্রদর্শনের আন্তরিকতাকে আমি উপলব্ধি করি তথাপি ইহা আমি প্রত্যাখ্যান না করিয়া পারি না (২০শে এপ্রিল)।

আজ জার্মানীতে যাহা চলিয়াছে এবং যে-ভাবে স্বাধীনতা দলিত হইতেছে গভর্নমেণ্ট-বিরোধী দলগুলির উপর যে অত্যাচার চলিতেছে, ইহুদীদের উপর যে কলংককর পাশবিক ব্যবহার করা হইতেছে তাহার ফলে সমগ্র জগতের সাথে আমার মনেও তীব্র ঘৃণা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নীতি মনুষ্যজাতির বিরুদ্ধে অপরাধ। যে গভর্নমেণ্ট আদর্শে ও কর্মসূচীতে এই নীতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছে তাহার নিকট হইতে সম্মান গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

কিন্তু আমার এই প্রত্যাহার সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে দেওয়া হইল না। একটিও কথা না বলিয়া ইহাকে ঢাকিয়া ফেলা হইল। প্রাগ ও কোপেনহেগেন হইতে প্রকাশিত জার্মান সাময়িক পত্রিকাগুলি মারফত আমার প্রতিবাদের প্রতিধ্বনি জার্মানীতে পৌঁছানো যখন ঠেকানো গেল না তখন সরকারী সংবাদপত্রগুলি এ-সম্পর্কে মুখ খুলিতে বাধ্য হইল। প্রথম প্রথম কিছুটা সংযম রহিল, যেন অনেকটা বেদনার সঙ্গেই। কোয়েলনিসে ৎসাইতুং পত্রিকায় ৯ই মে তারিখে আমাকে সর্বপ্রথম তিরস্কার করিয়া যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার ভাষা যথেষ্ট ভদ্র ও সংযত ছিল।

১৯৩৩ সালের জুন মাসে ফাশিস্ট-বিরোধী আন্তর্জাতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত

হয়। আমি উহার সভাপতি নির্বাচিত হই। ইহার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত জার্মান সংবাদপত্রগুলি আমাকে শত্রু বলিয়া প্রচার করিল না। কোয়েলনিসে ৎসাইতুং পত্রিকা আমার জবাব যথাযথভাবেই প্রকাশ করিল এবং জবাবে যাহা লিখিল তাহার মধ্যেও উগ্রতা ছিল না। যতই এই বিতর্ক দীর্ঘ হইতে লাগিল ততই বহু জার্মান লেখক এই বিতর্কে যোগ দিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন রুডল্‌ফ্‌ জি. বিন্ডিং। আমার জঁ্যা ক্রিস্তফের জার্মান প্রকাশক এই সমস্তগুলিকে সংকলিত করিয়া একখানি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। আমার প্রকাশক ছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন পাকা ব্যবসায়ী ও ঝানু বুর্জোয়া। আমি এই পুস্তিকার কোনো জবাব দিলাম না। আমার আর একজন জার্মান প্রকাশকও (তাহার কার্যও নিশ্চয়ই সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল) নিষ্পত্তির চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার চেষ্টা ছিল আমার প্রতিবাদ যাহাতে আদর্শগত আলোচনার নিরাপদ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। লাইপজিগ বিচারের মিটমাটের শেষ আশাটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

হে অতীত, বিদায়

১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত আমার দুই সিরিজ প্রবন্ধ সম্প্রতি আবার পড়িতেছি। প্রবন্ধগুলি দুইটি বিভিন্ন নামে (ও-দস্যু স্থ লা মলে ও লে প্রেক্যুরসোর) সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি একটি চিন্তাধারারই তথা একটি কর্মধারারই ক্রমবিকাশ; তখনকার দিনের ভাবাবেগকে তাই উহা গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। আর পড়িতেছি যুদ্ধের কয়েক বৎসরের আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী। এই ডায়েরীর ত্রিশটি অপ্রকাশিত খণ্ডে রহিয়াছে বহু চিঠিপত্র এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধাবলীর ভাষ্যরূপে আমার ভাববিবর্তনের পথরেখা; রহিয়াছে আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যের চাবিকাটি। এ যেন এক দীর্ঘ, ঝটিকাসংকুল সমুদ্রযাত্রা; যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু এ-যাত্রার শেষ হয় নাই। গত সতের বৎসর ধরিয়া এই যাত্রা চলিয়া আসিতেছে অবিশ্রান্তভাবে।

১৯১৪ সাল হইতে যাহারা আর আমার সন্ধান পায় নাই, ও-দস্যু স্থ লা মলে-র রচনাকালে, ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যে স্থানটি হইতে আমার এই যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম আজ সেই স্থানে আসিয়া তাহারা যদি মনে করে যে, আবার আমাকে তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে, তবে তাহারা খুব ভুল করিবে।

সেদিন এক অব্যাহত যাত্রার সবেমাত্র সূচনা। এই যাত্রাপথে আমি বহু সংস্কার, বহু মোহ, বহু বন্ধুত্ব পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। এই যাত্রা আমার আজও শেষ হয় নাই। এই যাত্রাপথের শেষপ্রান্তে

মানুষ যখন পৌঁছায়, তখন অঙ্গে তাহার আবরণ থাকে না, কারণ মলিন মাটিতে সে তখন তাহার পাকা আসন পাতিয়া বসে; ধরিত্রীমাতার কাছে তার সব লেনাদেনা চুকাইয়া দেয়।

যদি কখনও সময় পাই তবে ১৯১৪ সাল হইতে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ যাত্রার সমগ্র কাহিনী বলিব। এ-কাহিনী এমন এক স্বীকারোক্তি যাহার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের একটি মুমূর্ষু শ্রেণীর পুরা একটি পুরুষ তাহার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে—অবশ্য যদি এত কাণ্ডের পরও নিজের মুখের ছবি দেখিবার সাহস তাহার থাকে। এই শ্রেণীর বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী; ইহারই শুষ্ক শীর্ণ ভাবাদর্শকে ধ্বংস করিয়া এক নূতন জগতের শ্যামল সতেজ জীবনতরুকে যাহারা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে আমরা নিজেরাও আছি।

কিন্তু এখানে আমি যুদ্ধের চারি বৎসরে ভাববিবর্তনের গতিরেখা ছাড়া আর কিছুই আঁকিব না,—অদৃশ্য তীরন্দাজের ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত মুক্ত মনের শায়কের পথটিকে মাত্র আমি দেখাইয়া যাইব। কথায় বলে, ভালোভাবে যে কাজের শুরু, আধখানা তাহার সমাপ্ত। যাত্রারম্ভের প্রথম পদক্ষেপ পরবর্তীকালে যতই দ্বিধাদুর্বল মনে হোক না কেন, ঐ প্রথম পদক্ষেপের মধ্যে ত' সমগ্র যাত্রার পূর্বাভাস রহিয়াছে। পাশার দান পড়িয়াছে। এখন অবিশ্রাম আগাইয়া চলিতে হইবে, আর থামা চলিবে না।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই যাহার এইভাবে যাত্রা শুরু, নিশ্চয়ই সে জানিত না কী সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতেছে, জানিত না কীই বা ভবিষ্যতে পাইবে। জানিত না কোন দিগন্ত মুছিয়া যাইতেছে, ভাসিয়া উঠিতেছে কোন নূতন দিগন্ত। ......যাত্রী আসিতেছে বহুদূর হইতে। সে আসিতেছে পুরাতন বুর্জোয়া ফ্রান্স হইতে—প্রাচীন প্রাদেশিক ফ্রান্স হইতে; আসিতেছে পিতৃভূমি ও বিপ্লব এই দুই যমজধর্মের রসধারাপুষ্ট

দেশের অন্তর্লোক হইতে। (এই বিপ্লব ১৭৮৯ সালের বিপ্লব, তাহাদের কাছে একমাত্র বিপ্লব। ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী উহার আগেকার বিপ্লবকে করিয়াছে উপেক্ষা, পরের বিপ্লবকে করিয়াছে অস্বীকার। এই বিপ্লব তাহাদের নিজেদের বিপ্লব, তাহাদের আপন ভাগ্যের শীর্ষদেশে এই বিপ্লব তাহাদের উন্নীত করিয়াছে। তাহাদের ধারণা ছিল ভাগ্যকে তাহারা সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে; বিপ্লব তাহাদের করায়ত্ত)। ভালমির কামান গর্জনের মধ্যে, আর্মারের সংগীতধ্বনির মধ্যে এই দুই ধর্ম মিলিত হইয়াছিল। ইহাদের একটি পিতৃভূমি; আমার শৈশবকালে ১৮৭০ সালের রক্তস্নানে আপনার অবসন্ন শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল। প্লাস দ্য লা কঁকর্দের অভ্যন্তরে অবগুণ্ঠিত স্ট্রাসবুর্গের মূর্তিই ছিল তার বেদী, উপাসনা মন্দির, সেখানে নিত্য Revanche গান ধ্বনিত হইত।

বাকী রহিল রিপাবলিক। প্রেসিডেণ্ট গ্রেভী ও তাহার জামাতা উইলসনের আমল হইতে এই রিপাবলিক সম্পদশালী, আরামপ্রিয় ও সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহা সরকারী ধর্মসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, ১৮৮৯ সালে ইহার অভিষেক হয়; একশ' বছর আগে অধিকৃত বাস্তীয় দুর্গকে বুর্জোয়াশ্রেণী বিগ্রহ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে এই সময়, এবং এই বিগ্রহই হয় তাহার টাকার বাক্স। রিপাবলিকের উপাসনা মন্দিরে সর্বদা ইচ্ছা করিয়াই একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়া রাখা হয়, এই বিভ্রান্তির জন্ম সুদূর অতীতে। এই বিভ্রান্তির কথা আবার ভাবিতে হইবে। আর্মিডোরের তরবারির দিন হইতেই '৮৯ সালের বিপ্লবকে স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষীর দল প্রতারিত করিয়া আসিতেছে। ইহারাই ঐ বিপ্লবকে প্রথম নেপোলিয়ানেই অধীনে 'ডাইরেক্টরী'তে পরিণত করে। কিন্তু গিরোন্দিন ও আত্মবিক্রিত জ্যাকোবিনদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ একদিন যাহাদের তাহারা

গিলোটিনে বলি দিয়াছে তাহাদেরই সম্পত্তি ও টাকার থলির উপর দাঁড়াইয়া বিপ্লবের বাহিরের রূপ ও পদ্ধতি বজায় রাখিয়া আসিতেছিল। তারপর স্থূলকায় মেদস্ফীত হইয়া তাহারা কমিউনের 'শীর্ণদেহ মানুষগুলি'কে পিষিয়া মারিয়া নিজেদের 'পানামা' খালের পায়ে বিক্রয় করিল।

সেই 'পানামা' কলংকের দিনে আমি ছিলাম একজন তরুণ অধ্যাপক। বাস্তবসম্পর্কশূন্য নীতিজ্ঞান আমাকে শিখাইতে হইত। এক বৎসরের বেশি আমি ইহা সহ্য করিতে পারিলাম না। কিন্তু এই মিথ্যা প্রতারণামূলক নীতি কত পুরুষ ধরিয়াই না লোকে চোখ বুজিয়া গিলিয়া আসিতেছে। কতদিন ধরিয়া না 'স্বাধীনতা,' 'সাম্য', 'ভ্রাতৃত্ব' এই বমনোদ্রেককারী তিনটি কথার মধ্যে কত বড় না মিথ্যা আদর্শ আপনাকে প্রচার করিয়া আসিতেছিল। তবু কত লোকই না সর্বমনেপ্রাণে ইহা বিশ্বাস করিত। তাহাদের এই দেবতাত্রয়কে অগ্নি পরীক্ষায় যাচাই করিবার বিপদ হইতে তাহাদের রক্ষা করিয়াছিল। তখনকার সেই শান্ত নিরাপদ দিনে মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষুদ্র জীবিকা লইয়া নম্র, নির্জন, শ্রমবঞ্চিত, নিষ্কলুষ জীবনযাপন করিত। তাহাদের চোখে না ছিল বৃহৎ আদর্শের বিদ্যুদ্দীপ্তি, না বাজিত বুকে আঘাতের বেদনা।······

সময় যখন আসিল, কেহ তাহাকে অভিনন্দন করিল না। আসিল 'দ্রেইফ্যুস কলংকে'র আঘাত। পিতৃভুমি ও বিপ্লব পরস্পর সংবদ্ধ আদর্শের এই দুই মূর্তি দুই ব্যাঘ্রের মত মুখোমুখি দাঁড়াইল। দেখিলাম সরকারী মুখোশ খসিয়া পড়িতেছে; এক মুহূর্তে দেখিলাম স্বাধীনতা ও বল—দুই শক্তি: বিপ্লব ও সেনাবাহিনী—চারিদিকে হিংসা। সত্যনিশ্চেতন কোনো জাতির পক্ষে সহসা সত্যের মুখোমুখি হওয়া বড় বিপজ্জনক। কয়েক মাস ধরিয়া এই ঝড়ের ঝাপটে ফ্রান্স

ধূলিলুণ্ঠিত রহিল, মনে হইল সব বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কারো কারো মস্তিষ্ক চিরদিনের জন্য বিকৃত হইয়া গেল।

দুইটি পরস্পরবিরোধী বিশ্বাসকে কিছুতেই মিলিত করা গেল না; কোনো একটিকে পরিহার করাও গেল না। জনসাধারণ আর মাথা ঘামাইতে চাহিল না, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে তাহারা আবার ডুবিয়া গেল। এই সমস্যার গভীরে যাইবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না—অতএব একটা মৌন নিষ্পত্তির ফলে সংকটের অবসান হইয়া গিয়াছে। পরস্পরবিরোধী ও ছদ্মবেশী দুই মূর্তির মধ্যে একটা নির্বাক নিষ্পত্তি হইয়া গেল; কারণ তাহারা জানিত একের সমর্থন না থাকিলে অন্যের চলিবে না। এবং এই আপোসের প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি খোয়াইয়া জাতি বুদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আপোসরফা করিয়া আরামে গা ঢালিয়া দিল! আপোস হইল সবকিছুর—পিতৃভূমির, ন্যায়ের, স্বাধীনতার ও সভ্যতার। ইহাদের পতাকাতলে আবার আশ্রয় পাইল ডাকাতির সোনা—আশ্রয় পাইল রাষ্ট্রনীতি ও গুপ্তসন্ধির সেইসকল নায়কগণ যাহারা জাতির ভাগ্য ও বৃহৎ শক্তিনিচয়ের স্বার্থে বাকী পৃথিবীর লুটের ধন লইয়া জুয়া খেলায় মাতিয়াছিলেন।

১৯০০ সালের কাছাকাছি মুষ্টিমেয় কয়েকজন তরুণ (ইহাদের মধ্যে পেগির সহিত আমিও ছিলাম) এই আপোসের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। নিষ্কলুষ নিষ্ঠুর সত্যের নেশায় এই ছোট দলটি তখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর তাহাদের মনে আবার লাগিয়াছে বিটোফেন ও 'রেসারেকসন'-এর ছোঁয়া। সভ্যতার পাপ ও রাজনীতির ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কাইয়ের দ্য লা ক্যাজেন শুরু করিল দুঃসাহসিক আক্রমণ। পিতৃভূমি ও মানবসমাজ—এই দুই আদর্শ লইয়া আমরা তখন মগ্ন হইয়া ছিলাম। এই দুইয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার অথবা দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার জন্য

সময় না লইয়াই আমরা তাহাদের মন্দিরে যে-পাপ সাধিত হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইবার সংকল্প করিলাম। সংকল্প করিলাম ঐ মন্দিরে টাকার থলি খুলিয়া যাহারা দেনা-পাওনার আসর জমাইয়াছে তাহাদের দূরে তাড়াইয়া যুগল দেবতার পূজাকে পবিত্র করিয়া তুলিব। দুই দেবতা আমাদের কাছে তখন অভিন্ন। জঁা ক্রিস্তফ ও পেগি তখন কর্মের এক অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগে অধীর; এমন এক বীরধর্মে তাহারা আত্মাহারা, যাহার আবেগে যে কোনো বিশ্বাসের পদমূলে জীবন সঁপিয়া দিয়া, সর্বস্ব বলি দিয়া মানুষ শান্ত হয়। সেদিনের সেই নেশায় যাহারা পাগল হইয়াছিলেন এবং যাহারা সে ভাবসুরাপানকে কখনো অস্বীকার করেন না, তাহাদের একজন জঁা রিশার ব্লক! তাহার সম্প্রতি প্রকাশিত দেস্তঁ্যা দ্যু সিয়েক্ল্ পুস্তকে লিখিতেছেন (১৯৩১):

"আমাদের সমগ্র যৌবন কাটিয়াছিল একটিমাত্র কথার নেশায়: সেবা।" এই কথাটিই ছিল আমাদের জীবনবেদের মূলবাণী, আমাদের সম্মেলন মন্ত্র। ...টলস্টয়ের সমগ্র মানসজীবনকে অভিভূত করিয়াছিল-- এই একটি কথা।...পেগির সহিত জঁ্যা ক্রিস্তফ এবং ড্রেইফ্যুস সংকটযুগের অতীন্দ্রিয় ভাগাবেগ এ-সকল মিলিয়া আমাদের চারিপাশে মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও নির্ভিক কর্তব্যের এক দুর্গ গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমাদের ছিল স্বেচ্ছায় সেবার আদর্শ। আর এই আদর্শকে অনুসরণ করিয়াই আমরা ১৯১৪ সালের সংকটে স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছিলাম—'আমাদের আদর্শের ইহাই হইল সব চেয়ে শোচনীয় পরিণতি।' জঁা রিশার লিখিতেছেন "আত্মদানের এই অতিআসক্তির হাত হইতে আমি ছাড়া আর বিশেষ কেউ নিষ্কৃতি পায় নাই, কারণ আমি ছিলাম সকলের চেয়ে বেশি টলস্টয়পন্থী; তাই আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম এই

সেবা-দাসত্বের পরপারে ধর্মাসক্ত বিবেকের স্বাধীন, স্বতন্ত্র গভীর নির্জনতা।" জাঁ ক্রিস্তফ পড়িবার সময় পাঠক হয় ত' বুঝিতে পারিবেন কী গভীর দুশ্চিন্তা লইয়া আমি দেখিতেছিলাম যে স্রোতস্বিনী জাঁ ক্রিস্তফ নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল সেই স্রোতস্বিনীর মধ্যে আমার বন্ধুরা ও ছোট ভাইয়েরা ডুবিয়া যাইতেছে। তবে কি তাহারা তাহাকে অনুসরণ করে নাই!

অনুসরণ তাহারা ঠিকই করিয়াছিল! কিন্তু পরপার হইতে অনুসরণকারিদিগকে স্রোতউত্তরণে সাহায্য করিবার মত সময় ক্রিস্তফের ছিল না।

আমার নিকট আমার এই বন্ধুদের একজনের মায়ের লেখা একখানি চিঠি (১৯১৪ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখে লেখা) এখানে আমি উদ্ধৃত করিতেছি। বন্ধুটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক—নিষ্কলুষ, হৃদয়বান, প্রাণাবেগে পূর্ণ। যুদ্ধের প্রথমদিকে লোরেনের একটি সংঘর্ষে ইনি নিহত হন। চিঠিখানি এই:

"আমাদের একমাত্র পুত্র জার্মান বুলেটে নিহত হইয়াছে। যুদ্ধে যাইবার পূর্বে সে প্রায়ই আপনার কাছে চিঠি লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিত। জানি না শেষ মুহূর্তে এই বাসনা সে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কিনা এবং এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি তাহার অনেক বন্ধুর, যাহারা হয় ত' তাহার মত আজ এ-জগতে নাই, মনোভাব আপনার নিকট ব্যক্ত না করিয়া পারি না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সংশয় ও সমালোচনার মনোবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া যে-শক্তি ও বীরত্বকে প্রায়ই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এই প্রাণবান হৃদয়বান তরুণেরা সেই শক্তি ও বীরত্বকে আপনার রচনার মধ্যে খুজিয়া পাইয়াছে। আপনার রচনা পড়িয়া তাহারা সত্যই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে; আপনার প্রেরণার উত্তাপ তাহাদিগকে

জীবনের সহজ বাস্তবতা হইতে উর্ধ্বে তুলিয়াছে। আপনার বাণী তাহাদের দিয়াছে সেই আনন্দময় আবেগ, যাহা বুকে লইয়া তাহারা এতখানি দৃঢ়পদে রণাঙ্গনে যাত্রা করিতে পারিয়াছে, পশ্চাতের আকর্ষণে এতটুকু বিচলিত হয় নাই। তাহাদের বিয়োগ বেদনাকে আর এই ভয়াবহ যুদ্ধের অনুগামী দারুন দুর্দিনকে আমরা হাসিমুখে বহন করিব, তাহাদের আত্মবলিদানে সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করিয়া। তাহারা আপনার কাছে যে, কতখানি ঋণী তাহা আপনাকে জানাইতে চাই, আর জানাইতে চাই তাহাদের কৃতজ্ঞতা......"

এই কৃতজ্ঞতায় আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তারপর যখন শুনিলাম যুদ্ধের কল্যাণে আত্মবলিদানের গুণকীর্তনে বারেস ও বুর্জে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন, তখন আমার বেদনাবিদীর্ণ অন্তরের তলদেশ মথিত করিয়া তাহাদের উদ্দেশে এই আর্ত বাণী বাহির হইয়া আসিল: পাপিষ্ট তোমরা, এই তরুণ বীরদের হৃদয়ে আত্মবিনাশের বাসনার এই বীজ ত' আমরাই রোপন করিয়াছি। এ বলি ত' আমরাই প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু তোমাদের জন্য, তোমাদের যুদ্ধের জন্য ত' ইহা আমরা করি নাই। তোমাদের যুদ্ধ কাহাকেও কিছু করিতে পারে নাই। তোমাদের যুদ্ধে তাহারা খুন হইয়াছে।..."

যে মানুষ লিখিয়াছিল 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' এই হইল তাহার ট্রাজেডি। ১৯১৪ সালের শৌর্যবান এই এক পুরুষ—আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের, শিষ্যদের, সন্তানদের লইয়া গঠিত। আমাদের শিক্ষাতেই ইহারা শিক্ষিত, কিন্তু এই শিক্ষার প্রয়োগপন্থা তাহাদের জানাইবার মত সময় আমরা পাইলাম না। পাইলেও জানাইতে পারিতাম না। কারণ, স্বীকার করিব, আমাদের নিজেদেরই ইহা জানা ছিল না।

যেখানে দুই পথ আসিয়া মিশিয়াছে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া আমরা ইতস্তত করিলাম।

আমার এই স্বীকারোক্তি জাতির এক পুরুষের স্বীকারোক্তি। অন্য কাহারও চেয়ে আমার নিজের অপরাধ কম নহে। পিতৃভূমি ও মনুষ্য সমাজ—এই দুই আদর্শ লইয়া মারাত্মক বিভ্রান্তির অবসান আগস্টমাসের প্রথমদিকে আমাদের মধ্যে একজনও ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই। আমরা কোনোটিকেই ত্যাগ করিতে চাহিলাম না। দুইয়ের মধ্যে আপোস চলিতে পারে এই দুরাশায় অন্ধ হইয়া আমরা অন্ধকারে পথ হাতড়াইতে লগিলাম। আমরা, এই 'আমারা' বলিতে আমি কেবল বুদ্ধিজীবীদের কথা বলিতেছি না (বুদ্ধিজীবীরা তখন মক্ষিকাপালের মত ঘুরিতেছিল)। কর্মজীবী বহু লোকও ইহার মধ্যে ছিলেন; ইহাদের অনেককে আমি জানি। রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা ইহাদের কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন জোরে নিজে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইনি স্থির করিতে পারেন নাই, রোমক আদর্শে সমগ্র জাতির অস্ত্রসজ্জা অথবা জাগ্রত জনগণ কর্তৃক আত্মভাগ্য নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ, ইহার কোনটি শ্রেয়। কিন্তু, তখন গহ্বরমুখ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।··· পথ বাছিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু সময় আর নাই। আমাদের পক্ষ হইতে বাছিয়া লওয়া তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই দানবীয় অতীতকেই আমরা গ্রহণ করিয়াছি—যে অতীত আমাদের ভবিষ্যতকে লিখিতে শুরু করিয়াছে। তখন আমি সুইজারল্যাণ্ডে এক দীর্ঘ ক্লান্তির স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিতেছিলাম। সেই নয়নমনোহর গ্রীষ্মঋতুর জুন-জুলাই মাসের দিনগুলিকে অন্ধকার করিয়া আকাশে যে মেঘ জমিতেছিল, প্রেমের বাহুপাশে দৃষ্টি আবৃত থাকায় আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। (এত

মনোরম গ্রীষ্মঋতু ত' আর আসে নাই! ইউরোপে যখন হত্যাযজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল তখনকার সে-দিনগুলির সে কি চোখ-ধাঁধানো রূপ!)। আমার চোখের উপর হইতে দয়িতের চম্পক অঙ্গুলিগুলি যখন সরিয়া গেল তখন পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে ও যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে।

সেই অন্ধকারে পথ খুঁজিতে আমার সময় লাগিল। আর কাহাকেও যে পথ দেখাইতে পারি সে-কথা তখন চিন্তাও করি নাই। সে কাজ আমার নহে। আমি কি? আমি তখন একজন কবি ও সংগীতকার, যাহার ধ্যানের প্রাঙ্গনে মাঝে মাঝে ভবিষ্যত দুর্দিনের দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে মাত্র। (বিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইউরোপের ভীষণ দুর্দিনের পদধ্বনি আমার কানে আসিয়াছে, প্রথমজীবনে লিখিত আমার একাধিক নাটিকায় ইহার সাক্ষ্য আছে)।

কিন্তু এ পর্যন্ত রাজনীতি আমি স্পর্শ করি নাই। আমার মানসপুত্র, ত্রিশ বৎসরের আমি, জঁ্যা ক্রিস্তফ্ আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই আমার নামকে করিয়া তুলিল একটি সম্মেলনক্ষেত্র, পর্বতচূড়ায় একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা (জ্বলন্ত হইলেও যাহা ধূমবিহীন নহে); নৈতিক জীবনের পরিচালক ও সঙ্গী কোনো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল ফ্রান্সের তরুণগণ। কিন্তু যেখানে সমাজ-সংগ্রামে কর্মের প্রসঙ্গ আসিয়াছে, নির্দেশের জন্য আমি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়াছি, তাকাইয়াছি সোশিয়ালিস্ট নেতাগণের মুখের দিকে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধেয় বন্ধু। আনাতোল ফ্রাঁস ও অক্টাভ মিরাবোর মত সংস্কার-মুক্ত বুদ্ধিজীবীদের দিকেও তাকাইয়াছি। দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের পর তাহারা প্রবল প্রতিক্রিয়াবস্থার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। নির্দেশের জন্য গিয়াছি শিক্ষালয়ের পণ্ডিতদের নিকট, গিয়াছি আমার শ্রদ্ধেয়

সহকর্মীদের কাছে, যাহাদিগকে একল নর্মাল স্যুপেরিয়োর ও সরবন-এ প্রথমে ছাত্র হিসাবে ও পরে অধ্যাপক হিসাবে নিবিড়ভাবে জানিবার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ইহাদের স্বচ্ছ ধীশক্তি, যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনাপদ্ধতি ও সত্যানুরাগ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম ইহাদেরই আছে মনের স্বাধীনতা ও অকলংকিত বিচারবুদ্ধি।

অন্ধকারে দিশাহারা আমি তখন অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতে লাগিলাম, কখন তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিব : "এই পথে......"

আসিল না এই নির্দেশবাণী, আসিল শুধু রণাঙ্গনগামী সেনাবাহিনীর পদশব্দ, আর আসিল আরামকেদারাশায়ী বীরগণের অর্থহীন নির্বোধ গান : "আলে, আঁফাঁ দ্য লা পাত্রি।"

সকলেই তখন তাহাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ; জোরে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

আমি একেবারে নিঃসঙ্গ হইলাম। আগস্টের প্রথম কয়েক বৎসর নিজের সহিত কথোপকথন চালাইলাম, নানাভাবে প্রশ্ন করিলাম বিবেককে, করিলাম ঈশ্বরের মধ্যে আত্মগোপন। বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল পিতৃভূমি ও মানবসমাজ আমাদের এই দুই দেবতার একটি অপরটিকে গিলিয়া খাইয়াছে। যেটি রহিয়াছে সেটিকেও লোকে ভুলিয়া যাইতেছে।

এই একক দেবতায় বিশ্বাস অটুট রহিল কি কেবলমাত্র আমারই! কাল পর্যন্ত যাহাদের বিশ্বাস অটুট ছিল তাহাদেরও কেহ যখন কোনো কথা কহিলেন না তখন আমার কি বলা উচিত হইবে? কীই বা আমি বলিব? বলিবার কি অধিকারই আমার আছে? কেই বা আমার কথা শুনিবে? রণাঙ্গন হইতে বন্ধুগণের প্রথম পত্র আসিতে শুরু করিল। উৎসাহের আর অন্ত নাই ; ফরাসী কলিতে বিশ্বাস তাহাদের তখন উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে কলির হাজার

মাথা, অতীতের পিতৃভূমি, ভবিষ্যতের পিতৃভূমি, রাজন্যবর্গের পিতৃভূমি, গণতন্ত্রের পিতৃভূমি, ধর্মযুদ্ধের পিতৃভূমি, উপাসনামন্দিরের পিতৃভূমি আর পিতৃভূমি বিপ্লবের।

১০ই আগস্ট তারিখে ডায়েরীতে আমি লিখিলাম : "আমি কি করিতে পারি? এই যুদ্ধ সকলেই চাহে। ইহার বেদীমূলে নিজের রক্ত দান করিতে সকলেই ব্যগ্র। আমি আর তাহাদের করুণা করি না। নিয়তি নিজের পথে চলুক। কিন্তু ঘৃণাকে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিব না।"

De profundis clamans…"হে স্বর্গীয় শান্তি, হে আমার সংগীত, ঘৃণার তলদেশ হইতে আমি তোমাকে উপরে তুলিব…"

তখন আমি "আরা পাসিস" নামক গাথাটি লিখি (আগস্ট ১৫-২১)। যুদ্ধের মধ্যে এইটি আমার প্রথম সন্তান। কিন্তু শিশুটিকে আমি আমার নিজের কাছে রাখিলাম। আমি ছাড়া কে আর ইহার কণ্ঠস্বর শুনিবে। এক বৎসরের মধ্যে কাহাকেও ইহা শুনাইতে সাহস করি নাই। এক বৎরেরও অনেক পরে ১৯১৫ সালের বড়দিনের সময় সুইস পত্রিকাগুলিতে উহা প্রকাশিত হইল। কোনো ফল হইল না ; হইল শুধু কিছু স্থূল রসিকতার উদ্রেক।

ইতিমধ্যে প্রতিদিন আসিতে লাগিল বিপর্যয়ের সংবাদ। মন একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমগ্র বেলজিয়মে আগুন জ্বলিতেছে। ফ্রান্স পরিবেষ্টিত। মনে হইল বন্ধু, দেশ, সভ্যতা, সবকিছু যেন পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে ; মনে হইল নিজেও যেন উহাদের সাথে কোনো জঠর গহ্বরে আসিয়াছি। কখনও কখনও অন্যগুলির চেয়ে সাংঘাতিক কোনো অপরাধের কথা শুনিয়া আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে লাগিলাম। (২৯শে আগস্ট—১লা সেপ্টেম্বর তারিখে গেরহার্ড হাউপট্‌মানকে লিখিত চিঠি)। কোনো সেনাবাহিনীর চেয়ে ও

কোনো দেশের চেয়েও বড় কোনো কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বিদ্রোহ আমাদের পূর্বপুরুষগণের উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে, যে-দেবতায় আমরা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। এই প্রাচীন ক্ষমাহীন দেবতা আমাদের পিতৃভূমি। বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছিল তাহারই রক্তসিক্ত বিগ্রহের বিরুদ্ধে।

এই গহ্বরের মধ্যে আমি নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, আদর্শের আবেগে অধীর ইউরোপের বীর তরুণেরা কত বড় সাংঘাতিক ফাঁদে পা দিয়াছে, কতখানি সর্বনাশা দুর্বুদ্ধি তাহাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। আত্মোৎসর্গের মহিমা ও মৃত্যুর ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে একটি বিরোধ রহিয়াছে—আমার অন্তরকে তাহা বিদ্ধ করিল। সে-দিন যাহারা মরিতেছিল তাহাদের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এবং অপরদিকে যাহারা মারিতেছিল তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের বিদ্রোহ—এই দুই বিপরীত আবেগে আমার মন তখন বিদীর্ণ হইতেছিল। মারিতেছিল যাহারা তাহাদের মধ্যে ছিল রণযন্ত্রের পরিচালক পাপাত্মারা, আর ছিল উভয়পক্ষের শিবিরের শয়তান বুদ্ধিজীবীর দল যাহারা রণাঙ্গণের পশ্চাতে নিরাপদ দূরত্ব হইতে যুদ্ধরত তরুণগণের মাথার উপর দিয়া পরস্পরের কটুকাটব্য নিক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছিল।

তখন মার্ন-এর যুদ্ধ চলিতেছিল। এই অবস্থার মধ্যে (১১ই—১২ই সেপ্টেম্বর) আমি 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' রচনা করি এবং আমার জেনেভার পুরাতন বন্ধু পল সাইপেলকে পড়িয়া শুনাই।

আজ আবার ইহা পড়িতেছি, পড়িতেছি এই শ্রদ্ধাঞ্জলী সেই তরুণদের উদ্দেশে—যাহাদের একদিন বলি দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহারা শেষে আমাদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসের দৈন্য ও লঘুচিত্ততার শোধ তুলিয়াছিল। সেদিন যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, আজও আমি সেই মতই পোষণ

করি। সেদিনের একটি কথাও আজ প্রত্যাহার করিব না। ১৮৮০ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ আমার কৈশোরকাল সামাজিক অহমিকা ও হীন সুবিধাবাদের কদর্য আবহাওয়ার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, প্যারীতে তখন গণপরিষদ ও সাহিত্যক্ষেত্রে দুর্নীতির বন্যা চলিতেছে। আমার ছোট Aert-এর চেয়েও বেশি প্রাণবান, আত্মবলিদানের জন্য যাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের নিকট আমি নত হইতে পারি না। যদি এই আত্মবলিদানের লক্ষ্য (অন্তত মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর পক্ষে) এতখানি পবিত্র না হইত, তবে ক্ষমতা ও জনমতের নিয়ন্ত্রণকারীদিগের হাতে তাহাদের এমন ভীষণভাবে আহত হওয়া আরো শোচনীয় ব্যাপার হইত। আর তারপর, হাসিমুখে যাহারা শহীদ হইতে গেল তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমি তাহাদের হত্যাকারীদের (জ্ঞানেই হোক কিম্বা অজ্ঞানেই হোক) বিরুদ্ধে অভিযোগবাণী উচ্চারণ করিলাম। এই হত্যাকারীদের মধ্যে ছিল বক্তা, চিন্তাবীর, গির্জার নায়কগণ ও একাধিক গভর্নমেণ্ট। ইহার ফলেই তাহাদের সমস্ত আক্রোশ আমার উপর আসিয়া পড়ে; পাপাত্মারা নিজেদের চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে।

আমি আর কি করিতে পারিতাম? সঙ্গিহীন, সম্পদহীন সে দুর্দিনে একজন কতটুকু কি করিতে পারিত? বাঁধ ভাঙ্গিয়া ইউরোপ তখন পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে, আমার প্রবন্ধে আমি ইউরোপের ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম, ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম বিপ্লবের এবং একাধিক সাম্রাজ্যের অবসানের, ভবিষ্যদ্বাণী করিলাম জার্মান সাম্রাজ্য ধ্বংসের। "জারদের দিন একদিন আসিবে।"

তখন আমার একমাত্র আশা রহিল মুষ্টিমেয় স্বাধীন চিন্তাজীবীদের একত্রিত করিবার। ভাবিলাম অন্তত চিন্তার স্বাধীনতাকে রক্ষা

করিয়া যুদ্ধকে যথাসম্ভব অমানুষিক পরিণতির হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে। যুদ্ধ এবং যাহা কিছু মানবিক—এই দুইয়ের মিলন সাধন যে অসম্ভব তাহা তখনও বুঝিতে আমার বাকী ছিল। ২২শে-২৩শে সেপ্টেম্বর জুর্নাল দ্য জেনেভ পত্রিকায় যুদ্ধশাস্তির আবেদন জানাইয়া আমার যে রচনা প্রকাশিত হয়, সংযত ভাষায় লিখিত বলিয়া উহার কোনো ফল ফলিল না: রাইন নদীর তীরে তখন গত দশ দিন ধরিয়া মহাযুদ্ধের যে তীব্রতম সংগ্রাম চলিতেছিল তাহার উন্মাদনায় আমার এই আবেদন নিঃশব্দ বিস্মৃতির তলে মিলাইয়া গেল। তখন রঁ্যাস্ নগরে আগুন জ্বলিতেছে; সেই আগুনের মধ্য হইতে নিবিড় ঘৃণার যে বিষাক্ত ধূম বাহির হইয়া আসিতেছিল তাহার মধ্যে আমার মিনতি ঢাকা পড়িয়া গেল। সে মিনতি ফ্রান্সের কানে পৌছিল পুরা একটি মাস পরে; ফ্রান্স তখন আর সে-ফ্রান্স নাই।

আর একটি জিনিস প্রথম দুইমাস আমাকে হতাশার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। জার্মানসাহিত্যে ও পুস্তকে যে অবিশ্বাস, বিকারের প্রলাপ প্রকাশিত হইতেছিল তাহার তুলনায় ফ্রান্সের প্রকাশিত রচনা অনেকটা সংযত ছিল। সর্বোপরি আর একটি জিনিস হইল (ইহাকে বিশ্বাস বলিব কি আশা বলিব জানি না, কারণ বিশ্বাসের উৎস তখন শুকাইয়া গিয়াছে), সে জিনিসটি হইতেছে এই যে, রাশিয়াকে বাদ দিলে যে সব চেয়ে বড় শয়তান সে মিত্রশক্তিপুঞ্জের পক্ষে ছিল না।

শীঘ্রই আমার এ মোহ ভাঙ্গিল।

যে কদর্য ঘৃণাকে সাহিত্যিকেরা ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছিলেন, অথচ যাহাতে তাহাদের নিজেদের কোনো বিপদ ছিল না, তাহা ফ্রান্সের প্রায় সমস্ত সংবাদপত্র-জগতকে বিপুলবেগে সংক্রামিত করিয়া প্রায় সমগ্র জাতি ও তাহার ভাবধারাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথমে আমি ভাবিয়াছিলাম ইহা বোধহয় সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র। প্রথম

এবং সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক বিপদ যতই বাধা পাইতে লাগিল, ততই এই বিষাক্ত সংযম আরো উগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল, মৃত্যুর হাত হইতে সদ্য রক্ষা পাওয়া ভয়ার্ত পশু যেন তাহার প্রতিশোধ নিতেছিল। দেশের উপর দিয়া যে-ঝড় বহিয়া যাইতেছিল, তাহার হিংস্রতা সম্পর্কে মোহমুক্ত মনের কিছু তিক্ত অভিমত ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। "বর্তমান মানুষের সত্যকার মাপকাঠি কি হইবে" সে সম্পর্কেও লিখিয়াছিলাম।

যাহাদিগকে সব চেয়ে বেশি জানি মনে করিতাম তাহাদের প্রকৃতরূপ এই সংকটে চোখে প্রতিভাত হইয়াছে। মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে দেখিব ভাবিয়াছিলাম প্রিয় বন্ধুর স্নেহসিক্ত মুখচ্ছবি সেখানে দেখিলাম বাচ্চা নেক্ড়ের ফ্যানাসিক্ত দাঁত।"

কিন্তু বাচ্চা নেক্ড়ের চেয়ে বুড়ো নেকড়ে আরও বেশি সাংঘাতিক। এই বুড়ো নেকড়ে-দলের দলপতি ছিলেন বারেস। আর ভয়ে দিশেহারা হইয়া আনাতোল ফ্রাঁস তাহার সত্তর বছরের বার্ধক্যজীর্ণ-কণ্ঠে অন্যসকলের সহিত চীৎকার জুড়িয়া দিলেন; তিনি চীৎকার জুড়িয়া দিলেন কারণ সৈন্যদলে তাহাকে লইত না (২৮শে সেপ্টেম্বর)।

ইউরোপ হইতে আর কিছু আমি আশা করিলাম না। "সমস্ত ইউরোপটা যেন একটা উন্মাদ আশ্রম। এখানে প্রত্যেকেই যেন নিজেকে জগতপিতা ভগবান মনে করিতেছে।" (ডায়েরী, ২৮শে সেপ্টেম্বর)

১লা অক্টোবর তারিখ, অর্থাৎ অন্য সকলের চেয়ে চারবছর আগে যুদ্ধরত দেশগুলির বাহিরে একজন বিরোধ-নিষ্পত্তিকারীর অনুসন্ধান করিয়া প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্‌কে আমি লিখিয়াছিলাম, "মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, এই ভয়াবহ যুদ্ধের লক্ষ্য যাহাই হোক না কেন, পরিণতি

যে ইউরোপের ধ্বংসে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়াও যে-সকল হতভাগ্যের সংগ্রামের উন্মাদনা হইতে মুক্ত রহিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহারা আপনার ও আপনাদের দেশের দিকে তাকাইতেছে। যুদ্ধরত জাতিভ্রাতৃগণের কানে আপনার কণ্ঠস্বর যেন অবিলম্বে দৃঢ়ভাবে ও সত্যভাবে পৌছিতে পারে। এ-যুদ্ধে কেবল মাত্র যুদ্ধরত জাতিগুলির স্বার্থ বিজড়িত নহে ; এই অধর্ম যুদ্ধে সমগ্র সভ্যতা আজ বিপন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মবিস্মৃত ইউরোপকে আজ একথা স্মরণ করাইয়া দিক যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানুষের প্রতিভা ও পরিশ্রম যে প্রগতির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে, আপন দম্ভ ও ঘৃণার পরিতৃপ্তির জন্ম তাহা ধ্বংস করিবার অধিকার কোনো জাতির নাই।"

বলা বাহুল্য, হোয়াইট হাউস নিবাসী মানুষটি এ-আবেদনের কোনো জবাব দিলেন না।

৬ই অক্টোবর আমি ভেবে হইতে জেনেভায় রওনা হই, সেখানে ইন্‌টারন্যাশন্যাল রেডক্রসের কাজে আমি আত্মনিয়োগ করি। এবং রেডক্রস স্থাপিত যুদ্ধবন্দী অফিসে কার্য করি। ঐ তারিখে আমি লিখিয়াছিলাম :

মনুষ্য চরিত্র এবং সর্বোপরি বুদ্ধিজীবীশ্রেণী সম্পর্কে এই সংকটে আমার নূতন জ্ঞান লাভ হইল। এই আত্মাভিমান যুক্তিঅভিমানী, স্বাধীনতা ও মানবতার সহায় আদর্শের ধ্বজাধারী চিন্তানায়কেরা কত ত্বরিতে, কত সম্পূর্ণভাবেই না তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস ও আদর্শকে ধুলায় লুণ্ঠিত করিয়া দিতে পারে। যখন আবার শান্তি ফিরিয়া আসিবে, যখন দেখিব আবার তাহারা তাহাদের আদর্শের উদারতা ও মানবতার দম্ভ করিতে শুরু করিয়াছেন, তখন এ-দিনের কথা ভুলিব না। এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে তাহাদের কোনো অসুবিধাই হইবে না।

যদিও পশুশক্তির পুনর্জাগরণের দিনে এই দম্ভ এক মুহূর্ত রক্ষা করিবার সাহস তাহাদের নাই। "বন্ধুগণ তোমরা কত ভঙ্গুর।" এই কথাগুলি আজও খাটে; কারণ, শান্তিবাদ আজ আবার বেশ চালু হইতেছে। কারণ, ক্ষমতাধিষ্ঠিত শক্তির অর্থাৎ রাজনীতি ও স্বর্ণ-স্বার্থের অনুকূলে এই শান্তিবাদ আজ নিরাপদ শান্তির দিনে বসিয়া বণিকস্বার্থে পরিচালিত সরকারী ক্ষমতার আশ্রয়পুট হইতে শান্তি স্থাপন ও দেশপ্রেম সম্পর্কে যাহারা আজ আমাকে মুরুব্বির মত উপদেশ দিতেছেন তাহাদের কাহারও কাহারও আত্মসমর্পন নিজের চোখে দেখিয়া আমি ইতিমধ্যেই একটা তিক্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

অক্টোবর মাসে যুদ্ধবন্দীদপ্তরের কাজের মধ্যেই আমি দুইটি প্রবন্ধ লিখিলাম! একটির নাম "The Lesser of Two Evils" এবং অপরটির নাম "Inter arma caritas"। আজ প্রবন্ধ দুইটিকে অত্যন্ত নিস্তেজ মনে হয়। সেদিন আমি যুদ্ধকে আক্রমণ করি নাই, আক্রমণ করিয়াছিলাম শুধু ঘৃণাকে, তাহাও কেবলমাত্র শত্রুপক্ষের। মদগর্বিত জার্মানী তখন দাম্ভিক অপভাষণে আকাশবাতাস ভরিয়া তুলিতেছিল। তাহা ফ্রান্সে বহু বিশ্ববিখ্যাত মনীষীর স্বাক্ষরে তখন যে-সকল কদর্য প্রবন্ধ, ইশ্‌তাহার ও বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছিল তাহা এত বড় হইয়া কানে আসিতেছিল না। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন এই সংক্রামণে তাহারাও যে আক্রান্ত হইবেন, ইহা কেহই ভাবিতে পারে নাই।

স্তেফান জর্জের নামকরা শিষ্য, গ্যয়টের সাহিত্যের একজন প্রধান পণ্ডিত ফ্রিডরিখ গুণ্ডল্‌ফ্‌ লিখিলেন, "সমস্ত শ, মেটারলিঙ্ক্‌ ড'অনুৎসিও মিলিয়া সংস্কৃতির যতটুকু যাহা করিয়াছেন তাহার চেয়ে বেশি করিয়াছে আতিলা।" আরও লিখিলেন, "এক জার্মানী ছাড়া আর সমস্ত ইউরোপ পচিয়া গিয়াছে।" জার্মানীই একমাত্র দেশ "যে

সৃষ্টি করিতে পারে এবং সৃষ্টি করিতে পারে বলিয়াই যাহার ধ্বংসের ক্ষমতা আছে।" 'যুদ্ধকালীন চিন্তাকণা' পুস্তিকায় টমাস মান ফ্রান্সকে হীনভাবে অপমান করিলেন ও জার্মানদের নির্মম ধ্বংসকার্যে (বিশেষত র‍্যাঁস্ গির্জা ধ্বংসের ফলে) ফরাসীদের মন যে গভীর শোকে বেদনায় উন্মোথিত হইয়া ওঠে তাহাকে বিদ্রূপ করিলেন। জার্মান রণতান্ত্রিকতাকে তিনি সংস্কৃতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া সমর্থন করিলেন।

এই সকল কারণেই আমি ১৯১৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যাহা লিখি তাহাতে অতিমানব-নীতির নামে জার্মানদের এই ব্যভিচারে এতখানি তীব্র ও তিক্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল রচনায় ফরাসী মনস্বীদের সম্পর্কে যে প্রশংসার কথা ছিল তাহাকে অতিশয়োক্তি বলা চলিতে পারে কারণ, ফ্রান্সের মানসক্ষেত্রে যে গভীর বিপর্যয়ের শুরু হইয়াছিল তাহা তখনও আমি বুঝিতে পারি নাই। যাহা হোক, সোজা কথায় ফ্রান্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া আমি অপরাধ করিয়াছিলাম।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবার ফলেই আমার বিরুদ্ধে হীন আক্রমণের ঝড় বহিতে শুরু করিল। 'খ্রীষ্ট ও চিরন্তম সংগ্রাম' পুস্তিকার প্রশংসায় মুখর বুর্জে ও ফরাসী একাদেমীতে তাহার সতীর্থ ফ্রেদেরিক মাসঁ আমাকে আক্রমণ করিলেন। মাসঁ জার্মান প্রতিভাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন এবং বলিতেন, সংগীতকে আইন করিয়া 'র‍্যাঁ আলমাঁ' ও 'মার্সেইয়েজ' এই দুইটিতে সীমাবদ্ধ করা উচিত। ফরাসী একাদেমীর মত ধর্মসংস্রবমুক্ত প্রগতিবাদী বিশ্ববিদ্যালয়ও এই দলে ভিড়িল। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় সরবন-এ আমার সতীর্থ ফরাসীবিপ্লবের বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওলারও আমার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন।

২৩শে অক্টোবর মাতঁ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে আমাকে আক্রমণ করিলেন। এই প্রবন্ধে সরবন-এর নামে আমার সহিত সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তিনি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পরদিন লাকৃসিয় ফ্রাঁসের, লঁ্যাত্রাসিজঁা ও লা ক্রোয়া—সকলেই তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। ওলার, দোদে ও লা ক্রোয়া—এই তিনটি লইয়া হইল এক পবিত্র সম্মেলন। দূরে বসিয়া গর্বের সহিত আমি দেখিতে লাগিলাম আমাকে তাড়া করিয়া মারিবার জন্য তাহারা কি-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু একথা অস্বীকার করিব না যে, প্রথম আঘাতেই এই নির্লিপ্ততার পর্বতশিখর হইতে আমি পতিত হইলাম। লা ক্রোয়া আমার বিরুদ্ধে প্রথম যে তীরটি নিক্ষেপ করিল তাহা আমি আমার দেয়ালে টাঙাইয়া রাখিয়াছি, শিকারের পশুর দেহ বা দেহাংশ শিকারের কীর্তি হিসাবে শিকারী যে-ভাবে টাঙাইয়া রাখে। লা ক্রোয়া লিখিল :

"সরবন-এর প্রাক্তন শিক্ষক, বিদেশী ডিগ্রিধারী রম্যাঁ রলাঁ সুইস পত্রিকা 'জুর্নাল দ্য জেনেভ-এ তাহার জার্মান বন্ধুদের নামমাত্র তিরস্কার করিয়া মিত্রশক্তিপুঞ্জকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন কসাক, মরোক্কোবাসী সুদানী ও শিখদের সাহায্যে সভ্যতার ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার জন্য। নিজেকে সভ্যতার একটি স্তম্ভ মনে করিবার মত এই গগনস্পর্শী দম্ভকে মঃ ওলার মাতঁ্যা পত্রিকায় আক্রমণ করিতে দ্বিধা করেন। মঃ ওলার-ও ত' একসময় শান্তিবাদী ছিলেন।"

ইহার পরেও সামান্য যে কজন বন্ধু অবশিষ্ট ছিলেন তাহারাও বিমূঢ় হইয়া আমাকে থামিতে অথবা যাহা বলিয়াছি তাহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভয় পাইয়া আমার প্রকাশক আমাকে

লিখিলেন, প্রত্যহই নূতন নূতন পুস্তকের দোকান জ্যাঁ ক্রিস্তফ বয়কট করিতেছে; এই সঙ্গে অনুরোধ করিলেন যাহা কিছু লিখিয়াছি সব প্রত্যাহার করিয়া আমি যেন একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। রোজ সকালে প্রাতরাশের টেবিলে চাকর এক একগাদা করিয়া বেনামী চিঠি আনিত। চিঠির লেখকেরা আমাকে এই বলিয়া শাসাইতেন যে জোরে-র ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে আমার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে। আমার আক্রমণে সমগ্র সাহিত্যিক-পালটা যেমন আমাকে শেষ করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িল। তখন আলফ্রে কাপ্যুস নামক একজন ভদ্র লেখক-বন্ধু ফিগারো পত্রিকায় আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন।

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারিগণের উদ্দেশে লিখিত পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ আমি লিখিলাম। প্রবন্ধের তারিখটি লক্ষ্য করিতে হইবে: ১৭ই নভেম্বর, ১৯১৪। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসিয়াছিল প্রধানত আমার সেই প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করিয়া, যেগুলিতে তখনও পিতৃভূমির সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছিল। Inter Arma Caritas (৩০ শে অক্টোবর) ও বেলজিয়ামের সম্মানার্থে লিখিত ছোট দুঃসাহসিক শোকগাথা: "To the People who are suffering for Justice" (২রা নভেম্বর)—এই দুইটি রচনা পর্যন্ত ঐ ভাবধারা বলবতী ছিল।

আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পশ্চাতে যে কদর্য অন্ধ বিদ্বেষ ছিল সেদিন অপেক্ষা আজ আরো বেশি করিয়া তাহা অনুভব করিতেছি। জবাবপ্রসঙ্গে কোথাও আমি একটি কথাও প্রত্যাহার করি নাই। বরঞ্চ, পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই আরো জোর দিয়া বলিলাম। জার্মানীর প্রতি আমার সহানুভূতি ও মৈত্রীমনোভাব আমি সর্বপ্রতিকূলতার বিরুদ্ধে রক্ষা করিয়া চলিলাম। জার্মানীর নেতাদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত শাস্তির ঘোষণাবাণীর সহিত জার্মান

জাতিকে আমি কিছুতেই জড়াইতে চাহিলাম না। ফ্রান্সে যে সকল বুদ্ধিজীবী ঘৃণার বিষকে ফেনাইয়া তুলিতেছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে আমি অভিযান শুরু করিয়াছিলাম। বিশেষ করিয়া আমার একটি কথায় সাংঘাতিক বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। 'চিরন্তন যুদ্ধের' এই শয়তান প্রচারকগণকে আমি বলিলাম যে, এমন দিন আসিবেই যখন রাইন নদীর ওপারের প্রতিবেশীদের সহিত ব্যবসায়ের স্বার্থে তাহারাই সর্বপ্রথম হাত মিলাইবে। (গত দশ বৎসর ধরিয়া তাহারা যে এই কাজটি করিয়া আসিতেছে, একথা না বলিলেও চলে। ১৯১৫ সালের ফরাসী জাতীয়তাবাদী আজ জার্মানীর নিকৃষ্টতম বণিক জাতীয়তাবাদীর সহিত হাত মিলাইয়াছে)। কিন্তু কেহ যে বলিবে ইহা হইতেছে বা হইবে,—তাহা তাহারা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

আমার বন্ধুরা হতাশ ও ব্যথিত হইলেন। প্রকাশক আমাকে লিখিলেন : "ইহা কিছুতেই প্রকাশ করা চলে না কারণ ফল হইবে শোচনীয়। আপনার যে সকল রচনা বারুদের গাড়িতে আগুন লাগাইয়াছে, আমার বিশ্বাস এই প্রবন্ধটি তাহার চেয়েও বিপজ্জনক। এ সম্পর্কে কাপ্যুস ও অন্যান্য বন্ধুদের সহিত পরমার্শ করিয়াছি; বিদেশেও সকলেরই এই মত। প্রবন্ধটি প্রকাশ না করিতে, এমনকি বিদেশেও প্রকাশ না করিতে, আমি আপনাকে মিনতি জানাইতেছি। আপনার পক্ষ সমর্থন করিতে দিন অন্যদের, তাহারা চেষ্টা করিলে আপনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন।"

পরদিনেই (২৪শে নভেম্বর) আমি কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া লিখিলাম, "যদি বিশেষ অবস্থার দোহাই দিয়া বন্ধুগণ আমার অপরাধ স্খালনের চেষ্টা করেন তবে আমি প্রকাশ্যভাবে তাহাদের আমার পক্ষসমর্থনের অধিকার অস্বীকার করিতে বাধ্য হইব। আমার মত আমি কিছুতেই প্রত্যাহার করিব না, এবং এই মতপ্রকাশের অধিকারও

ছাড়িতে পারিব না। যদি দেখি আমার দেশ কোনো অন্যায় করিতেছে তবে তাহা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিতে আমি পারিব না। ইহাতে যদি আমার প্রাণসংশয় হয় তাহাও স্বীকার। আমি কোনো অজুহাত চাই না। আমার দেশের, আমার ফ্রান্সের জন্য আজ আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি: মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের কথা আজ এখানে এতই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। আত্মঘাতী অন্ধ উন্মাদনার হাত হইতে ফ্রান্সকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আমি তাহারই সম্মানকে বাঁচাইবার, তাহারই ন্যায় ও মানবতার ঐতিহ্যকে বাঁচাইবার জন্য আমি তাহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার দেশ একদিন একথা বুঝিবেই এবং বুঝিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিবেই।"

আমার এই সংকল্পকে আরো স্পষ্ট, আরো দৃঢ়, আরো কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য ৪ঠা ডিসেম্বর আমি 'বিগ্রহ' নামক প্রবন্ধ লিখি। ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে এত খোলাখুলি আক্রমণ ইতিপূর্বে কখনও করে নাই।

"ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের জন্য আমি আর গর্ববোধ করি না। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের চিন্তানায়কেরা যে অবিশ্বাস্য দুর্বলতা দেখাইয়া সমষ্টিগত নির্বুদ্ধিতার পায়ে আত্মসমর্পন করিয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে তাহাদের মেরুদণ্ড বলিয়া কোনো পদার্থ নাই।...

এই প্রবন্ধে পিতৃভূমিকে আমি এক পুতুলমূর্তিরূপে দেখাই। যে গণতান্ত্রিক-বিগ্রহকে মিত্রশক্তিগণ তাহাদের 'ন্যায়যুদ্ধের' রথের উপর বসাইয়াছিলেন তাহাকেও আমি পিতৃভূমি-বিগ্রহের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা দেখাইলাম না। 'এ পাষাণমূর্তিগুলি ভাঙিবে কে?' 'পিতৃভূমি, গণতন্ত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা' এ সকলের নিকটেই আমি 'স্বাধীনতা রক্ষা প্রতিষ্ঠা'র প্রতিবাদ জানাইলাম।

সেদিন হইতে অতীতের সহিত সম্পর্ক আমার একেবারেই ছিন্ন হইয়া গেল। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ যে সকল বন্ধুরা জনমতের, এমন কি নিজেদের মতেরও বিরুদ্ধে, তখনও পর্যন্ত আমার পক্ষ লইয়া লড়াই করিতেছিলেন তাহারা হতাশ হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিলেন। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ যিনি তিনি লিখিলেন 'বিগ্রহ' প্রবন্ধটি তাহার হৃদ্‌পিণ্ডে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। চিরদিনই আমার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত আমার মা পারী হইতে আমাকে জানাইলেন 'বিগ্রহ' পড়িয়া আমার সম্পর্কে আমার বন্ধুদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে—পরিবর্তন হইয়াছে আমার বিরুদ্ধে।" (২০শে ডিসেম্বর)

তবুও সেইদিন, ১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর' আমার ডায়েরীতে লেখা, "জুলাই মাসের পর আজ প্রথম আমি পিয়ানো স্পর্শ করিলাম।" প্রতি সন্ধ্যায় যাহার সাহচর্য আমি উপভোগ করিয়াছি সেই প্রিয়সঙ্গী সংগীতের সহিত সংস্রব রাখি নাই গত পাঁচমাস। (এই কয়মাস সমসাময়িক ঘটনাবলীর ভয়াবহতা হইতে মনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক মুহূর্তের জন্যও অবসরবিনোদনে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তিক্ত প্রশান্তির সহিত আমি লিখিলাম: "এই দেশগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও আমি বিচলিত হইব না; কারণ ইহারা স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, এমন কি ইহাতে যেন আনন্দও পাইতেছে। আমি আর ইহাদের জন্য সংগ্রাম করি না, আমার সংগ্রাম সম্মানের জন্য। আজ সন্ধ্যায় একটু মোজার্ট—আমার প্রিয় মোজার্ট—বাজাইয়াছি; আর বাজাইয়াছি কিছু প্রাচীন জার্মান ধর্মসংগীতের সুর।"

(ফ্রেদেরিক মাসঁ যদি জানিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেন!)

আমার মন হঠাৎ কেন এভাবে মুখ ফিরাইল? ডিসেম্বর মাসে দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছে।

ফ্রান্সে ঘৃণার বন্যা তখন এতখানি তীব্র ও হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল যেরূপ ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। ফ্রান্সের পক্ষে আশু বিপদ তখন কাটিয়া গিয়াছে, তাই ইহা আমার পক্ষে আরও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত ও স্বাধীনচেতা চিন্তাজীবীগণ এই কোরাসে যোগ দিয়াছেন। যোগ দিয়াছেন বের্গ্‌সঁ ও রেমি দ্য গুরমঁ। তাদের রাজা বারেস রাগে অন্ধ হইয়া শুধু জার্মানদের উপর নহে, ফরাসী শান্তিবাদীদের উপরও ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন আঁদ্রে বোনিয়ে-র, লুই ব্যারাত্রাঁ ও এমিল পিকার। ইহারা সকলেই জার্মান জাতির বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে অস্বীকার করিলেন। পারীর ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের রেক্টর বোদ্রিয়ার এই সুরে সুর মিলাইয়াছেন।

নৈতিক পরিস্থিতি একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। ঠিক সেই সময় বার্লিনের বিজ্ঞানপরিষদে জনৈক সদস্য ফাদার লাসনের উন্মাদ অপভাষণের একবাক্যে তীব্র নিন্দা করিতেছিল এবং লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট আস্টভাল্ড এর সহিত সর্বসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মহানুভবতা প্রদর্শন করিতেছিল। এইরূপে জার্মানী যখন চিন্তাজগতে স্বাভাবিক সহনশীলতার দিকে চলিয়াছে, তখন ফ্রান্স যেন কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামত চলিয়াছিল ঠিক ইহার বিপরীত পথে। 'পরিকল্পনামত' কথাটি আমি ইচ্ছা করিয়াই লিখিলাম কারণ, ফ্রান্স হইতে ব্যক্তিগতভাবে বা বিশ্বস্তসূত্রে আমি যে সকল খবর পাইতাম তাহাতে বুঝিয়াছিলাম ফরাসী জাতি যুদ্ধের প্রতি কতখানি উদাসীন ও শান্তির জন্য কতখানি তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই বিরুদ্ধে হিংস্র পশুপালের মত সমস্ত সংবাদপত্রগুলি একযোগে ঝাঁপাইয়া

পড়িয়াছিল শুধু বাহিরের নির্দেশে নহে—সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায়ও বটে।

যে-ব্যক্তির চরিত্রকে শ্রদ্ধা না করিলেও আর্টকে আমি শ্রদ্ধা করি তাহার সম্পর্কে এই কঠোর মন্তব্য করিতে হইতেছে বলিয়া আমি সত্যই বেদনা বোধ করিতেছি। কিন্তু হতাশাক্ষুব্ধ জার্মানীর মন্থর মৃত্যুর এক অগ্রিম স্বপ্নে যিনি পাশবিক উল্লাসে আত্মহারা হইতে পারেন, যিনি লিখিতে পারেন "নীল চোখ ও লাল চুলওয়ালা লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা কেমন করিয়া রাশিয়ানদের হাতে মরিতেছে ও মরিবে, কেমন করিয়া এক নিখুঁত অবরোধ-ব্যবস্থার কল্যাণে ফরাসী ও রাশিয়ানদের মধ্যে পিষ্ট হইয়া জার্মানী একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইবে" তাহার সম্পর্কে আমি কঠোর ভাষা ব্যবহার করিব না কেন?

এই ব্যক্তির ও তাহার হিংস্র দেশপ্রেমের কথা মনে পড়িয়া আজ ষোল বছর পরেও আমার মন বিতৃষ্ণা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সের পক্ষ লইয়া কথা বলিবার অধিকার তাহার আছে একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। তিনি যে-জাতের লোক হোন না কেন, আমার জাতের কেহ নন। আমার ও এই রক্তশোষকদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্রই থাকিতে পারে না।

কিন্তু শেষ আঘাত আসিল সুইজারল্যাণ্ড-প্রবাসী ফরাসীদের নিকট হইতে। তাহারাও স্বদেশের জ্ঞাতিভ্রাতাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিব্যুন দ্য লোজান পত্রিকায় রেনে পেইও আমাকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। খুব মুরুব্বিয়ানার সাথে তিনি আমাকে নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিলেন (ইহা আমি খুব উপভোগ করিয়াছিলাম এবং আশা করি আমার বর্তমান পাঠকেরাও করিবেন)। তিনি লিখিলেন, "তাহার লেখা পড়িয়া মনে হয় বিশ্বনাগরিক হইতেই তাহার সবচেয়ে আগ্রহ

বেশি।" পারীর বৃহৎ 'নির্ভুল' সংবাদপত্র-জগতে ও ১৭ই ডিসেম্বরের ল্য ত্যাঁ পত্রিকায় আমার প্রতি আক্রমণের বহর দেখিয়া জুর্ন্যাল দ্য জেনেভ শঙ্কিত হইয়া পড়িল এবং আমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতে শুরু করিল। যে সুইস শহরটিতে আমি থাকিতাম সেখান হইতে অনেক চিঠি পাইতে লাগিলাম। জেনেভার জনৈক কোমলহৃদয়া মহিলা লিখিলেন : "প্রত্যেক জার্মানকেই হত্যা করা দরকার।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জানাইলেন, "আঃ, জার্মানহীন ইউরোপ কী আরামের, কী শান্তির স্থানই না হইবে।"

পাঠক সহজেই বুঝিবেন কেন তখন মানুষের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আমি আবার আমার বিশ্বস্ত, উপেক্ষিত সহচর সংগীতকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু আরো কারণ ছিল। তখন আমার চোখ খুলিতে শুরু করিয়াছে ; যুদ্ধে মিত্রশক্তির দায়িত্বও আমি আবিষ্কার করিতে শুরু করিয়াছি। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ব্রিটিশ ব্লু বুক-এ আমি স্যার এডোয়ার্ড গ্রে-র সহিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের ১লা আগস্ট তারিখের সাক্ষাৎকারের কথা পড়িয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হই। জার্মান রাষ্ট্রদূত জানাইয়াছিলেন গ্রেট ব্রিটেন যদি নিরপেক্ষ থাকে তবে ফ্রান্স ও তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গায়ে হাত না দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে জার্মানী রাজি আছে। গ্রে স্পষ্টভাবে হাঁ না কিছু জানাইতে অস্বীকার করায় বিমূঢ় জার্মানী কৌশলে পাতা ফাঁদে পা দেয়। সেই বিশাল বিভ্রান্ত জানোয়ার তখন তাড়া খাইয়া বেলজিয়ামে ঢুকিয়া পড়ে। ইংরাজ শাসকশ্রেণী ইহাই চাহিতেছিল। জার্মানী এইভাবে ফাঁদে পা দেওয়ায় তাহারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণের সম্মতিলাভের একটা সুযোগ পাইল।

আমি জানি স্যার এডোয়ার্ড গ্রে-র অনিশ্চয়তা-নীতির এই ব্যাখ্যার

অনেকে প্রতিবাদ করিবেন (যদিও ইহার পরে আমাদের কিছু না বলা সত্ত্বেও ইংরাজ ঐতিহাসিকেরাই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন)। কিন্তু আমার এই ব্যাখ্যা সত্য হোক বা না হোক সেদিন হইতে আমার মনে সংশয় ঢুকিয়াছে; আমার মনের পক্ষে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা যে, সংশয় আজও যায় নাই। তাই আমি যুদ্ধের পাপের জন্য সমস্ত ইউরোপকে আক্রমণ করিলাম, দায়ী করিলাম সমস্ত রাষ্ট্রকে সমষ্টিগতভাবে। ১৯১৫ সালের ১১ই জানুয়ারী আমি লিখিলাম:

"ধীরে ধীরে আশঙ্কার সহিত আবিষ্কার করিয়াছি মিথ্যার বেসাতি একা জার্মানীই করে নাই। আমার কাছে প্রত্যেক যুদ্ধরত শক্তিই কমবেশি এইযুদ্ধের জন্য দায়ী। এমন হইতে পারে যুদ্ধের ইচ্ছা জার্মানীর সবচেয়ে বেশি ছিল না। কিন্তু ইচ্ছা তাহার যতটুকুই থাক, এমন কদর্যভাবে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের অপরাধ তাহারই সবচেয়ে বেশি দাঁড়াইয়াছে।"

১৯১৪-১৫ সালের ঘটনাবলী চিন্তাধারায় একটা গভীর, আকস্মিক পরিবর্তন আনিল। এটা খুব ছোট কথা নয়। বহুদিন, বহুমাস ধরিয়া তীব্র অন্তর্দাহের আগুনে পুড়িয়া আমার মধ্যে নূতন এক ব্যক্তিত্ব জন্ম লইল, মৃত অতীত সমাহিত হইল। সে-সকল অন্ধকার দিনে হৃদয়মনে গভীর যন্ত্রণা বহিয়া আমি দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া মৃত্যুর আস্বাদ লইতে চেষ্টা করিলাম।"

কিন্তু মৃত্যুর আলিঙ্গন বহুবার আমার মধ্যে জীবনের আস্বাদ জাগাইয়া তুলিয়াছে। সংগীতের মত মৃত্যুও আমার জীবনের এক বড় বিশ্বস্ত সহচর; সংকটমুহূর্তে যখনই পথ খুঁজিয়া পাই না তখনই আমার হাত ধরিয়া বলে আগাইয়া চল।

পথের সন্ধান পাইয়া আমি আবার যাত্রা শুরু করিলাম। কিন্তু মোড় ঘুরিতেই এবার আমাকে অতীতের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ

করিতে হইল। আমার সেদিনের বন্ধুরা এই পথপরিবর্তনের জন্য আমার অপেক্ষা করিয়া ছিলেন না। কিন্তু নূতন পথে আসিতেই আমার বহু নূতন বন্ধু লাভ হইল। দুঃসাহসী পাখীরা যেমন ঝড়ের বাতাস ঠেলিয়া আসে তেমনি তাহাদেরও অনেকেই আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। আমার 'সংগ্রামের উর্ধ্বে'র আবেদনে প্রথম সাড়া আসিল বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসা ইলিওনোরা ডিউসের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে। ১৯১৪ সালের ১৩ই অক্টোবর রোম হইতে তিনি কয়েক লাইন লিখিয়া পাঠাইলেন: "আপনার হৃদয় যেন আপনার নিজের বাণীর মধ্যেই তাহার সান্ত্বনা খুঁজিয়া পায়···ও দস্যু দ্য লা মলে··· আপনার কণ্ঠস্বর যেন থামিয়া না যায়···জানি আপনার কণ্ঠস্বর থামিবে না···"

সাড়া আসিল ইউরোপের অন্য প্রান্ত হইতে আর একটি রমণীর কণ্ঠস্বরে। ১৮ই ডিসেম্বর এলেই কে আমাকে অনুরূপ পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রান্স হইতে বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন বাণী আসিতেছিল। ওলার এবং পারীর সংবাদপত্র-জগৎ আমার বিরুদ্ধে যে-অভিযান শুরু করিয়াছিলেন তাহাতে আমার এইটুকু সুবিধা হইয়াছিল যে, হতাশাক্ষুব্ধ নিঃসঙ্গ ফরাসী জনসাধারণের অন্তরে আমার বাণী পৌঁছিয়াছিল; কারণ এ-ধরণের আক্রমণ আমার উপর না হইলে আমার আবেদন সম্পর্কে তাহারা কোনপ্রকার কৌতূহল দেখাইত না। আমার আবেদনে সাড়া আসিল সর্বপ্রথম এইসকল বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে: মার্সেল মাতিনে (২৪শে অক্টোবর) আমেদে দ্যুনোয়া (৪ঠা নভেম্বর), টলস্টয়ের পুরাতন বন্ধু পল বিরুকফ, বর্দোর দর্শনের অধ্যাপক দোর্দ্যা, আঁরি গিল্বো (ইনি ১৩ই নভেম্বর লা বাতাই স্যাঁদিকালিস্ত পত্রিকায় আমার উদ্দেশ্যে একখানি 'খোলাচিঠি' প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয়

দেন।) শোভেল্যঁ নামক লিসে ভল্‌ত্যার-এর একজন শিক্ষক, পি. জে. জুভ (২৫শে নভেম্বর), ম্যারসেরো, জর্জ পিয়ৃশ, ফেরন্যাঁ। দেপ্রে, ফ্রাঞ্জ জুর্দা, এদুয়ার দ্যুজাবৃদ্যাঁ, গুস্তাভ দ্যুপ্যা, জাক মেনিল, লিয়ঁ বাজালজেৎ, এমিলি ম্যাসন, গ্যাস্টন থিয়েসন, এ. প্রিভো, ফেলিসিয়ঁ। শালে এবং অন্যান্য আরো অনেকে।

ইংলণ্ডেও ইউনিয়ন ডেমক্রেটিক কণ্ট্রোল তখন ট্রেভেলিয়ান, ই. ডি. মরেল, নর্মান এঞ্জেল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনস্বীদের সহায়তা ও সমর্থনলাভে সমর্থ হইয়াছে। ১৪ই নভেম্বর কেম্‌ব্রিজ মেগাজিন পত্রিকায় 'সংগ্রামের উর্ধ্বে' প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তিকাকারে ইহা ব্যাপকভাবে বিতরিত হয়। ইহা লইয়া ব্যাপক ও গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়, তাহাতে দেখা গেল নিপীড়িত মানুষের প্রতি নিবিড় দরদ তরুণ সৈনিকদিগের হৃদয়েই সবচেয়ে বেশি।

১৯১৫ সালের ২২শে মার্চ বার্লিন হইতে আইনস্টাইনের একটি মহৎ বাণী আসিল : "পরস্পরকে ভুল বুঝিবার বদনাম পরিণতিস্বরূপ ফরাসী ও জার্মানজাতির মধ্যে যে গভীর বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আপনি যেরূপ দুঃসাহসিকতার সহিত আপনার মত ব্যক্ত করিতেছেন —সংবাদপত্র হইতে তাহার কিছু কিছু আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি গ্রহণ করুন। যাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিল তাহারা যে কেমন করিয়া এতখানি অন্ধ ও উন্মাদ হইয়া উঠিল তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আশা করি, আপনার দৃষ্টান্তে অনেকেই এই বিকারের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। এ যেন এক সাংঘাতিক সংক্রামক ব্যাধি। ইউরোপে গত তিন শতাব্দী ধরিয়া সংস্কৃতিক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত-ভাবে যে বিপুল কাজ চলিয়াছে তাহার ফলে কি কেবল ধর্মান্ধতা অপসৃত হইয়া তাহার আসনে অন্ধ জাতীয়তাবাদ অভিসিক্ত হইয়াছে ?

ভবিষ্যৎ যুগ কেমন করিয়া আমাদের এই ইউরোপকে শ্রদ্ধা করিবে? বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরাও দেখিতেছি তাহাদের বিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন গত আটমাস তাহারা কবন্ধ-জীবন যাপন করিতেছেন। আমি আমার সামান্য শক্তি আপনার হাতে তুলিয়া দিতেছি। আমার পদমর্যাদার কথা অথবা জার্মান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সহিত আমার সম্পর্কের কথা বিবেচনা করিয়া আপনি যদি মনে করেন আমি কোনোরূপ কাজে লাগিতে পারি তবে আমাকে কাজে লাগাইবেন।"

আরো একটি ঘটনা ঘটিল। তাহার গুরুত্বও কম নহে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসের শেষদিকে সোভিয়েট রিপাবলিকের ভবিষ্যৎ শিক্ষামন্ত্রী আনাতোল লুনাচারস্কি আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি আমার নিকট আসিলেন যেন ভবিষ্যতের দূত হিসাবে, আসিলেন ভবিষ্যৎ রুশবিপ্লবের অগ্রিম বার্তা বহন করিয়া। তিনি আমাকে জানাইলেন, যুদ্ধের পরে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিবে। কথাটি এমন সহজভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বলিলেন যে, মনে হইল সব যেন পূর্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে।

আমি বুঝিতে পারিলাম আমার পায়ের নিচে এক নূতন ইউরোপের, এক নূতন সমাজের সৃষ্টি হইতেছে সেই নূতন জগতের স্পর্শ অনুভব করিয়া আমি আশ্বস্ত বোধ করিলাম। ১৯১৪ সালের ২৬শে নভেম্বর আমি আমার এক জার্মান বন্ধুকে লিখিলাম (এই বন্ধুটি যুদ্ধের প্রকৃত কারণ স্বীকার করিতে চাহেন নাই):

"মিথ্যা মোহজালে নিজেকে আর জড়াইয়া রাখিবেন না। মুক্তির একটিমাত্র পথ আছে: পিতৃভূমির মতবাদ পরিহার করা। সভ্যতাকে যিনি বাঁচাইতে চাহিবেন তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে এই মোহবন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।"

গ্যাব্রিয়েল সাইলেসের সহিত দৃঢ় অথচ সৌজন্যপূর্ণ এক বিতর্কপ্রসঙ্গে আমি লিখিলাম :

"বহু পরস্পরবিরোধী মতবাদের হানাহানির মধ্যে আমাদের ক্ষণভঙ্গুর মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জাতীয় আদর্শ ও মানবীয় আদর্শ— এই দুইএর মধ্যে একটিকে আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। আপনি জানেন ফরাসী বিপ্লবের স্মৃতি আমার জীবনকে বহুদিন কিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সেই রুধিরাপ্লুত বীরগণের প্রতি আমার একপ্রকার অন্ধ আসক্তি ছিল। কিন্তু আজিকার এই সংকটের ফলে সে আদর্শ আমার অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে; ইতিহাসের যাদুঘর হইতে তাহাকে বর্তমান জীবনে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বিপজ্জনক। যা ছিল আমার যৌবনের স্বপ্ন ও আদর্শ আজ বুঝিতেছি ক্যাথলিক আদর্শের মতই তাহা নতুন যুগের নতুন আদর্শের স্বাধীন বিকাশের পথে ভীষণ অন্তরায়। নিষ্ঠুর হইলেও এই সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে।"

এইজন্যই আমার ভাবধারার প্রতি সত্যকার মজুরশ্রেণীর সহানুভূতি অথবা সত্যকার প্রতিক্রিয়াশীলশ্রেণীর ঘৃণার কোনোদিন অভাব হয় নাই। এ. প্রিভা (২৬শে ফেব্রুয়ারী), রসমার (৫ই মে), ফেরর্ন্যা দেপ্রে প্রমুখ ব্যক্তিগণ পারী হইতে আমাকে লিখিয়া জানান, মজুর-শ্রেণীর মধ্যে যে-সকল সিণ্ডিকালিস্ট মজুর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের আনুগত্য ত্যাগ করেন নাই তাহাদের মনে আমার প্রবন্ধে কতখানি কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি জাগিয়াছে।

১৯১৫ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখে হেন্‌রি মাসিস্‌ ওপিনিয়ন পত্রিকার আমার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে 'ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রমঁ্যা রলাঁ' নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তিনি আমার যতখানি উপকার করিলেন তাহা আর কেহ করেন নাই।

তাহার আনাড়ীর মত এই বিষোদ্গার প্রচারের পক্ষে ফরাসী সেন্সর কর্তৃপক্ষ এমন সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিলেন যাহা আমার 'সংগ্রামের ঊর্ধ্বে' পুস্তিকায় প্রচারকার্যে আমার বন্ধুগণ পান নাই। এইভাবে জনসাধারণের মনে আমার সর্বনাশের বীজ বপন করাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ফল হইল—আমার সমস্ত বন্ধুরা মিলিয়া আমার ভাবধারাকে যতটুকু প্রচার করিতে পারেন নাই তাহার অনেক বেশি প্রচার করিলেন ইনি। ১৬ বছর পরে আমি আজ তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমার সকল শত্রুই যদি মাসিসের মত ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হইতেন তবে আমার কাজ অনেক সহজ হইত, আমার ভয় ছিল আমার বন্ধুদের সম্পর্কেই বেশি। ইহাদের মধ্যে একজনের সহিত ছিল আমার বিশ বৎসরের বন্ধুত্ব। মত পরিবর্তনের ভয়ে ইনি আমার লেখা পড়িয়াও দেখিলেন না, অথচ আমাকে আক্রমণ করিলেন। বন্ধুদের মধ্যে আর ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন, দুর্বলমতি ভ্যারআয়েরঁ। (মতবিরোধ সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে চিরদিনই ভালবাসিয়াছি)। ইনি তখন জঘন্য ঘৃণাব্যঞ্জক কবিতা প্রকাশ করিতেছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম কৃতকার্যের ফল পাইলেন, অনুশোচনাও করিলেন। কিন্তু সেই বিষাক্ত আবহাওয়া হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। গাব্রিয়েল দানুন্‌ৎসিও-র মত কদর্য কবির সহিত আমি তাহাকে কখনই এক করিয়া দেখিব না। জেনোয়ার নিকট কোয়ার্টোতে বসিয়া তখন তিনি তাহার কপট কাব্য 'সারমন্ অন দি মাউণ্ট' প্রকাশ করিতেছিলেন। এই কাব্য পড়িয়া আমার আড়িয়তোর দেয়ালে সিগ্নোরেলি লিখিত খ্রীষ্টবিরোধীদের হত্যার ইঙ্গিতে পূর্ণ কাব্যের কথা মনে পড়িয়াছিল। বন্ধুদের মধ্যে আর ছিলেন আনাতোল ফ্রাঁসের মত দাম্ভিক, বিদ্বেষ-দুষ্ট ভদ্র-পোশাক পরিহিত যোদ্ধার দল। যতদিন পর্যন্ত না 'ধ্বংসকার্য সুসম্পন্ন

হইবে এবং 'সুবিচারের সত্যযুগ' প্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধশান্তির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া যাইবার সংকল্পকে ইহারা কোনো-দিন গোপন করেন নাই।

এই হিংস্র নপুংসক নির্বুদ্ধিতার আবহাওয়ার মধ্যে, যখন জার্মানী লুসিতানিয়া জাহাজে টর্পেডোর আঘাত করিল (৭ই মে) এবং ফ্রান্স আকাশ হইতে কার্লস্রুহে শিশুদের উপর বোমা ফেলিয়া (জুন) তাহার প্রতিহিংসা লইল। তখন আমি লিখিলাম "আমাদের প্রতিবেশী শত্রু" (১৫ই মার্চ) "যুদ্ধের পুস্তকাবলী" (১৯শে এপ্রিল) এবং "বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর হত্যাকাণ্ড" (১৪ই জুন)। ইহার পর হইতে আমার উপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়িল। গুলি আসিতে লাগিল উভয়পার্শ্ব হইতে। ল্য তাঁ পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধে একটি নূতন অভিযোগ আনা হইল। আমি নাকি 'নূতন পিতৃভূমি' নামক জার্মান প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিতেছিলাম এবং এই প্রতিষ্ঠানটি নাকি ফ্রান্সের নৈতিক মনোবল ধ্বংস করিবার জন্য জার্মানীর নূতন সমরোপকরণ (৭ই জুলাই)। জার্মানরাও আমাকে ক্ষমা করিল না। তাহাদের গভর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতির জন্য তাহাদের কেহ কেহ প্রাণদান করিয়াছে লিখিয়া ফরাসীদের চোখে তাহাদের সম্মান কমাইয়া দিবার জন্যই বোধহয় এই আক্রমণ। রাইমের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট স্টার্টগার্ট হইতে প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় আমাকে তীব্রভাবে অপমান করিলেন: "মুখোশ ছিঁড়িয়া ফেল। রমঁ্যা রলাঁর জবাব।" মেসার নামক গিসেনের একজন অধ্যাপক অভিযোগ আনিলেন আমি নাকি তাহার বন্ধু ডাক্তার ক্লাইনের প্রতি যে মনোভাব দেখাইয়াছি তাহা যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পরোক্ষে সমর্থন। ইনি লিখিলেন ডাক্তার ক্লাইন প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় জার্মান কর্তৃক বেলজিয়াম আক্রমণ সমর্থন করিয়াছিলেন। (ইহাতে তিনি তাহাকে প্রশংসা করিতে চাহিয়াছিলেন) এবং

সর্বোপরি, জার্মান সুইজারল্যাণ্ড হইতে প্রকাশিত একখানি আন্তর্জাতিক পত্রিকায় আহৃত জার্মান অন্ধ জাতীয়তাবাদের এই চমৎকার অভিব্যক্তিকে পরম সন্তোষ সহকারে প্রকাশিত করিয়া তাহা অস্বীকার করিবার জন্য আমাকে আহ্বান জানাইল। এই পত্রিকাখানি সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের মিলন সাধনের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিতেছে বলিয়া জাহির করিত।

এই উন্মাদদের লইয়া আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল। ১৯১৫ সালের ৩রা হইতে ৭ই জুলাইয়ের মধ্যকার আমার ডায়েরীতে (আন্তর্জাতিক যুদ্ধবন্দী-দপ্তরে আমার কাজের শেষ কয়দিন) আমি লিখিলাম:

"গত বারোমাস ধরিয়া অবিচারের হাত হইতে আমার নিজের আত্মাকে এবং যাহারা রণাঙ্গনের পুরোভাগে লড়াই করিতেছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্য সংগ্রামের পর আজ বুঝিতেছি আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আমার ক্রমেই মনে হইতেছে ইউরোপীয় যুদ্ধ সৌরজগতের একটা সংকট। এ-যেন একটা সমষ্টিগত বিকৃতির অভিব্যক্তি। ইহার মূল রহিয়াছে জাতি-রসায়নের রহস্যময় নিয়মের মধ্যে, জাতিতে জাতিতে বিপজ্জনক সংমিশ্রণের মধ্যে। হয় ত' ইহারও অতিরিক্ত কিছু। হয় ত' ইহা উপগ্রহের এক অসুস্থ অবস্থা, হয় ত' তাহার যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে। দাঁড়াইয়া দেখা ছাড়া করিবার কিছুই নাই। আমি কয়েকমাসের জন্য অন্তর্লোকে আত্মগোপন করিতে যাইতেছি।"

১৭ই জুলাই তারিখে জার্মান ও ফরাসী কুকুরগুলিকে পাঠাইয়া দিলাম। জুরিখের International Rundschau পত্রিকার সম্পাদককে এই চিঠিখানি লিখিলাম। সম্পাদক সৌজন্যসহকারে চিঠিখানি প্রকাশ করিলেন।

"গত এক বৎসর ধরিয়া আমার সমস্ত বিশ্রাম, সমস্ত সাফল্য, সমস্ত

বন্ধুত্ব বিসর্জন দিয়া আমি অন্ধ, উন্মাদ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি। দুইটি যুদ্ধরত জাতিকে, বিশেষত আমার জাতিকে, আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, তাহার শত্রুও তাহার মতই মানুষ, তাহারাও দুঃখ-বেদনার অংশীদার। আমি আশা করিয়াছিলাম আজিকার জার্মানীতে এমন একটি ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইব যাহা ফ্রান্সের হৃদয়তন্ত্রীতে দরদের স্পর্শ বুলাইয়া সেখানেও অনুরূপ ভাবের উদ্বোধন করিবে এবং ফলে এমন সংকীর্ণতামুক্ত স্বাধীন চিন্তার সৃষ্টি হইবে যাহা দুইটি জাতির মধ্যবর্তী অকারণ বিদ্বেষের গভীর গহ্বরের উপর মৈত্রীর সেতু বাঁধিতে পারিবে। আমার আশা পূর্ণ হয় নাই। আমার প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই উভয়দেশ হইতে আমার ভাগ্যে তিরস্কার ছাড়া আর কিছু জুটে নাই। উভয় দিক হইতেই আসিয়াছে একই ধরণের নির্বুদ্ধিতা। আমি থামি নাই বটে কিন্তু এই নির্বুদ্ধিতা আমাকে অবশেষে অস্ত্রহীন করিয়াছে। মঃ মেসার খুশি হইবেন। তিনি আমার নিকট এইটুকু চান যে, তাহার বন্ধুর গৌরববৃদ্ধির জন্য আমি যেন সমস্ত জগতকে জানাইয়া দিই যে, তাহার বন্ধু জার্মান কর্তৃক বেলজিয়মের নিরপেক্ষতা-ভঙ্গকে সমর্থন করিয়াছেন। জানাইয়া আমি দিব। এবং জানাইয়া দিয়া ফরাসী পাঠকদের মনে ডাক্তার ক্লাইনের প্রতি যে শ্রদ্ধার উদ্রেক আমি করাইয়াছি তাহা চূর্ণ করিয়া দিব। জার্মানদের রাষ্ট্র-আনুগত্যকে ভুল বুঝিয়াছি বলিয়া মঃ মেসার আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন; বলিয়াছেন, আমি নাকি যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার চেষ্টা চোখের উপর দেখিয়াও নীরব রহিয়াছি। অথচ ফরাসী লেখকদের মধ্যে কেবলমাত্র আমি এই যুদ্ধকে অন্তত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঘৃণার আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিয়া মানবিক করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। ক্লান্তিতে, হতাশায় আমি আজ

স্বেচ্ছায় দূরে চলিয়াছি এমন এক অন্ধ সংগ্রামের মধ্য হইতে যেখানে যোদ্ধাদের মধ্যে অন্ধ উন্মাদনা ছাড়া আর কিছুই নাই, যেখানে যোদ্ধারা বারবার এককথাই আবৃত্তি করিয়া চলে অথচ একবারও ভাবিয়া দেখে না অপরের মনে কিভাবে উহা সঞ্চারিত হইবে। আমি ইহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলাম। আমি দুঃখ করি না; কারণ, আমি কর্তব্য করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ বুঝিয়াছি ইহা করিয়া লাভ নাই। তাই আজ চলিয়াছি আর্টের মধ্যে আশ্রয় লইতে, বাহিরের আঘাত-সংঘাতে যে-আশ্রয়স্থল কোনোদিন ভাঙ্গিবে না।

তথাপি আমি একবার শেষ চেষ্টা করিলাম। রক্তাক্ত বৎসরটি পূর্ণ হইয়া গেল; আসিল জোরে-এর হত্যাকাণ্ডের বার্ষিকী। আমি এই মৃত্যুর স্মরণে ও মৃতের সম্মানে কিছু লিখিতে চাহিলাম। সংগ্রামের 'উর্ধ্বে'র প্রবন্ধাবলীর এইটিই ছিল শেষকথা। কিন্তু এই শোক শ্রদ্ধাঞ্জলিটি জুর্নাল দ্য জেনেভ পত্রিকায় প্রকাশ করিতে কতখানি বেগ পাইতে হইয়াছিল ইউরোপের জনসাধারণ তাহা জানিলেন না। মৃত্যু-বার্ষিকী দিনের জন্য লিখিত প্রবন্ধটি প্রকাশের অসম্মতি জানাইয়া সম্পাদক ২১শে জুলাই তারিখে আমাকে লিখিলেন:

"জনসাধারণ, এবং বিশেষ করিয়া ফরাসী জনসাধারণ, বুঝিবে না এই ঘটনাটির জন্য আমরা এতখানি স্থান ব্যয় করিতেছি কেন। কারণ এই মহান সমাজতন্ত্রী নেতার নামে তাহারা সাম্যবাদের ভয় পায় এবং হয় ত' অন্যায়ভাবেই তাহারা ইহাকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া জাতীয় প্রতিরোধ শিথিল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করে।"

আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইলাম এবং আমার বন্ধু পল সাইপেলের সাহায্যে প্রবন্ধটিকে ২রা আগস্ট প্রকাশিত করাইলাম। কিন্তু তৎপূর্বেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্লান্ত হইয়া আমি জেনেভা পরিত্যাগ

করিয়াছি। আমি আবার মাটির সংস্পর্শ লাভের জন্য চলিয়াছিলাম। আমি লিলুলি ও ক্লের‍াঁবো এই দুই পুস্তকের খসড়া রচনা করিয়াছিলাম। সংবাদপত্রে অভিযান চালাইয়া যাইবার জন্য মনাৎ আমাকে যে-অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে ১০ই আগস্ট তারিখে আমি লিখিলাম :

"তুমি যতই নিজেকে ভার-উত্তোলনের দণ্ড বানাইতে চাহ না কেন, ভাররক্ষার জন্য প্রস্তরখণ্ডের তোমার আবশ্যক। সে প্রস্তরখণ্ড কোথাও মিলিল না।"

কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, আমার এই অবসরগ্রহণের ফলে আক্রমণের তীব্রতা কমিয়ে গেল। তীব্রতা বাড়িয়ে গেল দ্বিগুণ। ল্য গোলোয়া এইরূপ আক্রমণের মধ্যে বেশ নাম করিয়া লইলেন। আলব্যার গিনঁ আমাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন (৭ই আগস্ট)। বৃদ্ধ ফ্রেদেরিক মাসঁ পর পর কয়েকটি প্রবন্ধে আমাকে হীনভাবে আক্রমণ করিলেন। তারপর আসিলেন আক্রমণকারিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান পল-ইয়াসঁ্যাৎ লোয়াসঁ, ইনি আক্রমণ শুরু করিলেন ১৫ই আগস্ট তারিখে। যদি কয়েক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে থামাইয়া না দিত তবে কবে যে তিনি নিজে থামিতেন তাহা বলিতে পারি না। তথাপি তিনি আমার মৃত্যুই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। আমি কখনও তাহাকে জবাব দিই নাই। ইহাই তিনি কোনোদিন ক্ষমা করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি এত বাড়াবাড়ি শুরু করিলেন এবং আমাকে লইয়া এত বেশি লিখিতে শুরু করিলেন যে, অবশেষে আমার শত্রুরাও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ঘৃণার আর সমস্ত অধিকারই আছে একটি অধিকার ছাড়া— বিরক্তিকর হইবার অধিকার তাহার নাই। কিন্তু ঘৃণাকে বিরক্তিকর করিয়া তুলিবার প্রতিভা লোয়াসঁ-র ছিল। এই প্রতিভার সদ্ব্যবহারের

আনন্দ হইতে তিনি যেন বঞ্চিত না হন আমি তাহাই কামনা করিতাম। এই সকল নীচতা ও আরো বহুপ্রকারের ক্ষুদ্রতাকে আমি ভুলিবার চেষ্টা করিলাম কয়েকজন মহাপ্রাণ ব্যক্তির সাহচর্যে। ইহাদের মধ্যে ছিলেন স্প্রিটলী; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লুসার্নে গিয়াছিলাম; ছিলেন আইনস্টাইন; ইনি ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভেবেতে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন; আর ছিলেন আমার তখনকার দিনের প্রতিবেশী সিঙ্কিভিচ এবং শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারের আলফ্রেড এইচ ফ্রায়েড।

আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত গাবুনের ল্যাম্বারিন নামক স্থানের একটি হাসপাতাল হইতে আলসেসের একজন বিখ্যাত মনীষী অ্যালবার্ট সোয়াইজার আমাকে ভ্রাতৃত্বের অভিনন্দনবাণী পাঠাইলেন (ইহাকে ফরাসীদের বেতনভুক নিগ্রোদের পাহারায় রাখা হইয়াছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস!) ইনি আমাকে লিখিলেন যে, "মনুষ্যের আবাসহীন অরণ্যের নির্জনতায় পর্যন্ত" প্রবন্ধগুলির প্রতিধ্বনি গিয়াছে এবং "আমার ভাবধারা এই দুর্দিনে একটি পরম আশ্বাস ও সান্ত্বনার বস্তু ...সংগ্রাম চালাইয়া যান, আমার হৃদয় আপনার সহিত রহিয়াছে যদিও বর্তমান অবস্থায় আপনাকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" কিন্তু স্প্রিটলীর 'প্রমেথুস্'ই ছিল তখনকার দিনে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী। ইহা ছিল আমার নিকট পাহাড়ের বুক চিরিয়া বাহিরে আসার ঝরণার মত। আল্পস্ পাহাড়ের এই দুর্দম, দুঃসাহসী বীরের আত্মা যেভাবে আমার আকুল স্বাধীনতা-পিপাসাকে মিটাইতে পারিত পৃথিবীতে আর কিছু তাহা পারিত না। যাহা যউক কয়েকমাস অন্তর্লোকে বাসের পর এই সকল মৈত্রীতীর্থে পুণ্যস্নান সারিয়া আমি আবার রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সংগ্রামের

তখন এক নূতন সুর শুরু হইয়াছে। তখন আর জুর্নাল দ্য জেনেভ পত্রিকায় লিখিবার প্রশ্নই উঠে না। উহা তখন শান্তির বিরুদ্ধে, পোপের বিরুদ্ধে, হলাণ্ডের বিরুদ্ধে, ফোর্ড মিসনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এক কথায় যাহারাই যুদ্ধরত জাতিগুলির মধ্যে একটা আপোসের চেষ্টা করিতে চাহিতেছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে পাগলের মত চীৎকার করিতেছিল। চার্লস বের্নার-এর ক্ষুদ্র পত্রিকা রেভু মঁস্যুয়েল ছাড়া জেনেভাতে এমন একখানি সুইস পত্রিকা ছিল না যাহাতে আমি লিখিতে পারি। কিন্তু একজন ফরাসী সহকর্মী আমার জুটিয়া গেল। ইহার নাম আঁরি গিলবো। এই ফরাসী তরুণটির উৎসাহ ছিল অসীম। সংগ্রামের উত্তেজনায় তাহার নাসারন্ধ্র যেন সর্বদা বিস্ফারিত হইয়া থাকিত। ইনি ছিলেন এক মূর্তিমান সংগ্রাম। ১৯১৫ সালের জুন মাসের প্রারম্ভে তিনি পারী হইতে জেনেভায় আসেন এবং ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে ডমঁ্যা নামক পত্রিকা বাহির করেন। আমি ছিলাম ইহার ধর্মপিতা এবং অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। সব সময়েই যে তাহার সহিত আমার মনের মিল হইত তাহা বলিতে পারি না। আমি যতটা চাহিতাম তাহার চেয়েও উগ্র ছিল এই পত্রিকার সুর। জেনেভায় কয়েকমাস থাকিবার পর লেনিন, রাডেক, জিনোভিয়েভ প্রমুখ প্রবাসী রুশবিপ্লবীদের সহিত গিলবোর মিশিবার সৌভাগ্য হয়। ফলে তাহারা এই তরুণকে বিপ্লবের পথে টানিয়া লইয়া যান, যে-পথে তখনও আমি পা দিই নাই। ইহা ছাড়া আবেগ ও উত্তেজনার আতিশয্যে গিলবো এমন ভাষা ব্যবহার করিতেন, অথবা এমন সকল কাজ করিয়া বসিতেন যাহার ফলে যে আদর্শকে আমরা রক্ষা করিতেছিলাম তাহাই বিপন্ন হইয়া পড়িত।

যুদ্ধের মধ্যে শত্রুদের অপেক্ষা বন্ধুদের সহিতই আমার সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল বেশি এবং আমার বিশ্বাস এ অভিজ্ঞতা অস্বাভাবিক নহে।

গিলবো ও আমার মধ্যে কত পত্রালাপই না হইয়াছে। তথাপি আমার এই তরুণ বন্ধুটির নিষ্কলঙ্ক আদর্শনিষ্ঠা কঠোর আত্মাভিমান ও দুঃখব্রতী নিঃস্বার্থপরতা এবং দুঃসাহসী বীরত্বের পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি না দিয়া আমি পারি না। ফ্রান্সের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি এই লোকটির বিরুদ্ধে যে কতখানি হীন কুৎসা প্রচার করিয়াছে তাহা কি বলিব (ইহার অদম্য মনোবলকে তাহারা এখনো ক্ষমা করিতে পারে নাই)। অবশেষে সুইস কর্তৃপক্ষ তাহাকে প্রথমে কারাগারে নিক্ষেপ করে ও পরে নির্বাসিত করে। তারপর ক্লেমাঁসোর উকিলেরা তাহাকে ধরিয়া মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। (১৫ বৎসর পরে এই দণ্ডাজ্ঞার পরিবর্তন হয়)। ব্যক্তিগত সাহস ও চিন্তশীলতা ছাড়াও তাহার আর একটি গুণ ছিল। তিনি ছিলেন সংগঠনকার্যে পারদর্শী। তাহার সম্পাদনায় ডমাঁ্যা পত্রিকাখানি প্রথম বৎসরেই আলোচনায় ও তথ্যপ্রচারে একটি উচ্চস্তরের পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হয়। যুদ্ধের মধ্যে অন্য কোনো আন্তর্জাতিক পত্রিকা ইহার সমকক্ষ হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। ইউরোপের স্বাধীন-চেতা বুদ্ধিজীবীদের নাম ও প্রবন্ধ এই পত্রিকাখানি একত্রিত করিয়াছিল। ই. ডি. মরেল, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ফ্রিডেরিক ভান এডেন, হেরিয়েট রোলাণ্ড হলস্ট, এ. ফোরেল, লাৎস্কো, ফ্রিৎস এডলার প্রমুখ বুদ্ধিজীবিগণ এবং প্রবাসী রুশবিপ্লবীগণের সমগ্র দলটিই এই পত্রিকার মারফত আত্মপ্রকাশ করিতেন! আমিও ইহাতে 'To the Eternal Antigone,' 'A Woman's Voice in the Battle', 'Liberty', সেক্সপিয়র সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে 'The Murdered People' এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করি। শেষোক্ত প্রবন্ধটি যুদ্ধ সম্পর্কে আমার মনোভাবের একটি নূতন পর্যায়ের সূচনা করে। এই রচনাগুলি আমার ব্যথার ধ্যানের একটি

বৎসরের বহু অন্ধকার দিন। ইহার মধ্য দিয়াই আমি ক্লেরাঁবো-র সহিত বেদনার পথে চলিয়াছিলাম। ফ্রান্স ও তথা সমগ্র ইউরোপকে যে রক্তবন্যায় তখন প্লাবিত করিয়াছিল তাহার হাত হইতে পলাইয়া প্রথমে জেনেভায় ও পরে শিয়েরে আমার যে-কয়জন অল্পসংখ্যক ফরাসী বন্ধু আশ্রয় লইয়াছিলেন—এই রচনাটি প্রথমে তাহাদের পড়িয়া শুনাই। এই দলটির মধ্যে ছিলেন রেনে আর্কস, পি. জে. জুভ, আঁদ্রে জুভ, ফেরনাঁ ডেপ্রেস, গ্যাস্টন থিয়েসন, ফ্রাউস মাসেরেল, ক্লড ল্যালিভেস্, মাদ্‌মোয়াজেল এস দ্যুশেন ও আমার বীর ভগ্নী মাদ্‌ল্যান। কেবল মাত্র যুদ্ধের সঙ্গে নহে, প্রাচীন সমাজ ও তাহার অন্তর্লীন ধনতন্ত্রী বুর্জোয়া ব্যবস্থার সহিত সর্বসম্পর্ক ছেদনের সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল, এই প্রবন্ধটির সূচনাতে সমস্ত সতর্কতা আমি দূরে পরিহার করিলাম। জাতিসমূহের বিরুদ্ধে এক তীব্র অভিযোগ আনিলাম। আমি মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেখাইলাম সত্যকারের পাপীকে: সত্যকারের পাপী—সোনা।

"ইউরোপীয় রাজনীতিতে আজ যে অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে— সবচেয়ে বড় আবর্জনা সেথায় সোনার তাল। যে-শৃঙ্খল সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রান্তভাগ রহিয়াছে কুবেরের হাতে; শুধু কুবের নহে, কুবের ও তাহার কুকর্মের অনুচরদের হাতে। কুবেরই আজ প্রত্যেক রাষ্ট্রের সত্যকারের প্রভু ও নেতা। তাহার হাতে তাহারা আজ হীন ব্যবসায় ও কদর্য লেনদেনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আদর্শের জন্য মানুষ আত্মদান করে কিন্তু আত্মদান করিতে যাহারা পাঠায় তাহারা জীবনে স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই জানে না। যুদ্ধ দীর্ঘ হইলে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে যুদ্ধ কতখানি বাণিজ্যের জন্য, কতখানি অর্থের জন্য……"

সেদিন যাহা সত্য ছিল আজ তাহা একশত গুণ বেশি সত্য। একদিন

যেমন সোনা যুদ্ধকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করিয়াছিল আজ পৃথিবীর শান্তিকেও তেমনি সোনাই প্রভাবিত ও পরিচালিত করিতেছে। খুশি হইলে এই সোনা যুদ্ধের পথ গ্রহণ করিবে, একটি যুদ্ধ, প্রয়োজন হইলে দশটি যুদ্ধ হয় ত' হইবে আগামী কাল (হয় ত' আজই) যদি না বিপ্লব আসিয়া তাহাকে বাধা দেয়। কারণ, আজ এই বিপ্লব আসিয়াছে—তরুণ, জোয়ান ও সশস্ত্র। বিপ্লব আজ আমাদের দ্বারে পাহারা দিতেছে। ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে ইহার আগমনকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, ইহার অভ্যুদয়কে আমি অভিনন্দন জানাইয়াছিলাম, কিন্তু বেদনার সহিত মনশ্চক্ষে ইহাও আমি দেখিয়াছিলাম যে এই বিপ্লবের অভ্যাগমে ঘৃণার অভিযান দ্বিগুণ শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিবে, ধ্বংসের শ্মশানে ইউরোপ মরিয়া পড়িয়া রহিবে।

"হে ইউরোপ বিদায়···তুমি আজ কবরে পথ হাতড়াইয়া ফিরিতেছ, কবরেই তোমার স্থান, কবরেই তোমার শয্যা। জগতের নেতৃত্বভার অন্যে গ্রহণ করুক।"

এই রচনার তারিখ ১৯১৬ সালের ২রা নভেম্বর।

বিপ্লব তখনও আরম্ভ হয় নাই কিন্তু সমগ্র ইউরোপের ভস্মের আচ্ছাদনের মধ্যে বিপ্লবের আগুন জ্বলিতে শুরু করিয়াছিল। ফ্রান্সে মজুরশ্রেণীর একটা সংখ্যালঘুদলের মধ্যে তখন আবার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছে। সি জি টি-র একটা শাখার নিকট হইতে আমি এক পত্র পাইলাম (১৯১৫ সালের ৫ই-৮ই সেপ্টেম্বর)। জিমারবাল্ট যাইবার পথে মারহাইম চিঠিখানি আমাকে দিয়া গেলেন। লেনিন যেখানে কিছুদিন আগে শ্রেণীসংগ্রাম ও মজুর-বিপ্লবের জন্য শক্তিশালী আবেদন করিয়া গিয়াছিলেন সেখানে আসিলেন কিয়েন্থল (১৯১৬ এপ্রিল মাসের শেষভাগ)। এমনকি ফরাসী সেনাবাহিনীর

মধ্য হইতে বিদ্রোহের সাংঘাতিক কানাকানি ও কথাবার্তা আমার কানে আসিতে লাগিল। আমি ইহাকে সমর্থন করিলাম না; কারণ, এই অন্ধ ক্ষোভ ও অসন্তোষের না ছিল কোনো আদর্শ, না ছিল কোনো সংগঠন, না ছিল কোনো নেতা—যিনি তাহাদের শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতে পারেন। পশ্চিম ইউরোপে লক্ষ্যহীন ধ্বংস অথবা কতকগুলি সামরিক বিবৃতির মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি হইতই। গিলবোর নিকট লিখিত বহু পত্রে আমি ইহার তীব্র নিন্দা করি। লেনিন নিজে উহার উৎসাহ দিতেন কিনা আমার সন্দেহ আছে কারণ, চিন্তাশীল ও কর্মবীর নেতা মাত্রেই শৃঙ্খলাহীন কার্যকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে হঠাৎ বড় খবর আসিল। আশার অধীর উত্তরের বাতাস জেনেভার পথে পথে সে-খবর বহন করিয়া আনিল। বাতাসে রক্তবসন্তের সৌরভ পাওয়া গেল। খবর আসিল রাশিয়া তাহার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়াছে। ঐ সময়েই গর্কির নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইলাম। লেখক চিঠির মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া—নূতন বড়দিনের আনন্দবার্তা জানাইয়াছেন! 'খ্রীষ্ট উঠিয়াছেন'! যুদ্ধরত একটা মহাদেশের ওপার হইতে এপারের আমাকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। জেনেভায় স্বাধীনচেতা ফরাসীদের আমাদের সমস্ত দলটি রুশ বড়দিনের অভিনন্দনে একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল: 'সত্যই তিনি উঠিয়াছেন'। সকলের সম্মিলিত স্বাক্ষর সম্বলিত একটি পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করিলাম। যে-পুস্তিকা আমরা প্রকাশ করিলাম উহার মধ্যকার আবেদনটি রচনা করিলাম আমি নিজে। আবেদনটির নাম 'স্বাধীন ও স্বাধীনতার প্রতি ধাবমান রাশিয়ার প্রতি' (১৯১৭ সালের ১লা মে)।

পশ্চিম ইউরোপের আমাদের মত আমেরিকা হইতেও স্বাধীনচেতা

বহু মনস্বী রুশবিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদের মর্মস্থল এই আমেরিকা তখন যুদ্ধের নৈবেদ্য খাইয়া মেদস্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই মধ্য হইতে আসিলেন ম্যাক্স ইস্টম্যান ও তাহার মাসেস পত্রিকার প্রধান সহ-সম্পাদক জন রীড। জন রীড কয়েকমাস পরেই অক্টোবর-বিপ্লবের অপূর্ব ইতিহাস রচনা করিয়া অমর হন। আজ তাহার দেহ ক্রেমলীন-প্রাচীরের তলে লেনিনের পার্শ্বে সমাহিত। ইহাদের উদ্দেশ্যে আমি মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলাম।

ইউরোপের জাতিগত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে, ফ্রান্সের সোশিয়ালিস্ট ও সিণ্ডিক্যালিস্ট সংখ্যালঘু দলের পক্ষ হইতে, স্বাধীন মতবাদের সংবাদপত্রগুলি ও রুশ বিপ্লবীদলের দ্বারা যে প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছিল তাহার সংবাদ নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বের সহিত চাপিয়া যাইবার জন্য আমি একটি প্রবন্ধে এই প্রথম সুইস সংবাদপত্রগুলিকে আক্রমণ করিলাম। সে-প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে একটা বিদ্রোহের আগুনের উত্তাপ অনুভব করা যায়। এ-বিদ্রোহ তাহাদেরই যাহারা "সমুদ্রের উপর দিয়া এবং সমুদ্রের চেয়েও বিশাল মানুষের নির্বুদ্ধিতার উপর দিয়া ইউরোপ নামক কারাগার হইতে আমেরিকা নামক কারাগারের সহিত হাত মিলাইয়াছে।"

ইহারই অল্পকাল পরে আমি ই. ডি. মরেলের পক্ষ সমর্থন করি তিনি তখন ইংলণ্ডে অত্যন্ত কদর্য অবস্থার মধ্যে কারারুদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ডে আমার নিকট তাহার একখানি রাজনৈতিক পুস্তিকা পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ অভিযোগটি শুধু হাস্যাস্পদই নহে, একেবারে মিথ্যা। 'সৈনিক সর্বহারাদের' নামে হত্যালিপ্সু পুরাতন জগতকে বায়বুস্ একটি প্রবন্ধে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারিফ করিয়া

বারবুসকে পত্র দিলাম। এইখানেই ক্ষান্ত হইলাম না; সেনাবাহিনীতে যে-সকল তরুণ ফরাসী বুদ্ধিজীবী ছিল তাহাদের ক্ষোভ ও বেদনার আর্তনাদের জবাবও দিলাম।

সীমান্তের অপর পারে যাহারা ছিলেন তাহাদের বিদ্রোহ ও বেদনাকে আমি প্রকাশিত করিতে লাগিলাম। ইহার মধ্যে ছিল লাৎস্কোর বিক্ষারের আর্তনাদ, স্তেফান ৎসাইগের বাইবেলের মত বিষণ্ণতা, ফাদার নিকোলাইয়ের যুদ্ধের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। উৎপীড়িত ও কারারুদ্ধ এই জার্মান পণ্ডিতকে আমি একজন 'মহান ইউরোপীয়ান' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলাম। ইহাও জানাইলাম আমার দিক হইতে আমি কিছুতেই নিজেকে ইউরোপ ও ইউরোপীয় ঐক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। আমার কল্পনার 'বিশ্বদেশের' মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়াও রহিয়াছে, রহিয়াছে সমগ্র মানবসমাজ!

১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ 'ফর দি ইন্টারন্যাশনাল অব মাইণ্ড' নামক একটি প্রবন্ধে আমি আমার 'ইউরোপের বাহিরে বিশ্বমানবতা' প্রবন্ধের পুনরায় অবতারণা করি। এই প্রবন্ধে ইহাই আমি বিশেষভাবে বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, 'আমি মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবীর জন্য সংগ্রাম করিতেছি না; এ সংগ্রাম জনসাধারণের জন্য, আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্য—যাহা কেবলমাত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্য নহে।'

১৯১৬ সালের অক্টোবর মাস হইতে দ্যমাঁ পত্রিকাখানির উপর সমাজসংগ্রামের ছাপ পড়ে। গিলবো-র ইচ্ছা ছিল তাহার জেনেভার বন্ধু বোলশেভিক নেতাদের সহিত ইউরোপের উপর দিয়া বিপ্লবের মশাল বহিয়া সে পেট্রোগ্রাডে যায়। তাহা না গিয়া সে ফরাসী সুইজারল্যাণ্ডে তাহার পত্রিকাখানিকে রুশবিপ্লবের মুখপত্র করিয়া তোলে। লেনিন, ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ, রাকোভস্কি, রাডেক, কালেনিন, জিনোভিয়েভ, লুনাচারস্কি অর্থাৎ পুরাতন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া নূতন

গড়িবার যুদ্ধের সমগ্র সামরিক নেতৃমণ্ডলীর সদস্যদের নাম আমার প্রায়ই এই পত্রিকাখানিতে চোখে পড়িত। রুশবিপ্লব ও রুশ বিপ্লবীদের সে সমর্থন করিত দুঃসাহসের সহিত। কিন্তু তাহার পত্রিকাখানির মত রুশবিপ্লবের ঘটনামালার এত ভাল ইতিহাস ফরাসী ভাষায় আর নাই।

আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম শুধু নিরপেক্ষ দর্শক হিসাবেই। বিপ্লবের বীরগণের মহত্ত্ব ও তাহাদের আদর্শের উচ্চতার প্রতি আমার সহানুভূতি ছিল বটে কিন্তু তাহাদের হিংসাত্মক রক্তপাতের পথ আমাকে কেবলই দূরে ঠেলিত। আমি কর্মী ছিলাম; আমার কাজ ছিল চিন্তা। আমি ভাবিতাম ইউরোপের চিন্তাধারাকে পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ রাখিবার চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে লেনিন আমাকে সঙ্গে করিয়া রাশিয়ায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং গিলবো-র মারফৎ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি রাজি হই নাই।

মানসিক বিবর্তনের যে-স্তরে তখন আমি পৌঁছিয়াছি তখন বিপ্লবকে আমি ভুল করিয়া একাধিক রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ বলিয়া ভাবিতাম, সেইজন্য চিন্তা জগতের প্রহরীর স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে আমি রাজি হই নাই। আজ আর আমার ওভাবে ভাবা চলে না। আজিকার মত সেদিন তখনও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, এমন কি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া ভাবাদর্শের, অভ্যন্তরটা এমনভাবে চোখে পড়ে নাই। 'বুদ্ধিজীবীর কুলীন গোষ্ঠী' নামক (এমন কি যখন 'আন্তর্জাতিক' নামে তাহারা জাহির করে তখনও) অদ্ভুত জীবের ভিতরটা তখনও আজিকার মত পড়িতে পারি নাই। যে চরিত্রবল, নাগরিক সৎসাহস ও চিন্তার বলিষ্ঠতা ঐ গোষ্ঠীর আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, দেখিলাম তাহার কিছুই নাই। ইহারা মুখে সত্যের বড় বড় বুলি আওড়ায়,

এই বুলিতে নিজেদের ঢাকিয়া রাখে। বাস্তবক্ষেত্রে সত্যকে ইহারা ভয় পায়। সত্যকে ইহারা নিজেদের কাজে লাগায়। ইহারা এত দূর যায় যে, সত্যকে সাহিত্যিক প্রসাধন হিসাবে, আর্টের অধরের কৃত্রিম রঞ্জনী হিসাবে ব্যবহার করিতেও ইহাদের বাধে না। এইভাবে ইহারা নিজেদের জাহির করে। লেখকদের মধ্যে সৌন্দর্যের উপাসক যিনি সবচেয়ে বেশি, তিনি রাস্তায় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য সত্যকে পণ্যা নারীর মত ব্যবহার করেন।

যদিও জঁা ক্রিস্তফের সঙ্গে আমিও বহু পূর্বেই সত্যের এই সকল গণিকা ও দালালদের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, তথাপি আরো কত দেখিবার বাকী থাকিল তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই—বুঝিতে চাহি নাই। ইহার পরেও আশা করিয়াছিলাম ইউরোপের মনস্বীগোষ্ঠীর মধ্য হইতে ছোট অথচ দুঃসাহসী, আদর্শনিষ্ঠ, সংকল্পবদ্ধ একটি উপদলের অভ্যুত্থান দেখিতে পাইব এবং ইহারাই চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, প্রেক্যুরসোর পুস্তকের শেষ প্রবন্ধগুলি ইহাদেরই লক্ষ্য করিয়া লেখা। ইহাদের একত্রিত, দলবদ্ধ করিবার জন্য, ১৯১৯ সালের বসন্তকালের 'ঘোষণাবাণীটি' পুস্তকের সর্বশেষে সন্নিবেশ করি। সমগ্র জগতের শত শত শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরের স্বাক্ষর ইহাতে রহিয়াছে।

কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই আবেদনটির রচনা করিতে বসিয়া আমার চিন্তা বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে, 'বিশ্বজনগণের' সেবায় তাহাদের নিয়োগ করিতে চাহিয়াছে—যে বিশ্বজনগণ 'দুঃখ ভোগ করে, সংগ্রাম করে, পরাজিত হয়, আবার ওঠে, আবার রক্তসিক্ত প্রগতির কঠিন পথ বাহিয়া যাত্রা শুরু করে।' তারপর ১৯১৯ সালের জুনমাসে 'প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট লিখিত পত্রের' ভাষ্য হিসাবে আমি উহাতে যে-নোট (এই পত্রে) লিখি ঃ প্রেসিডেণ্টকে' কোনো

দলবিশেষের নহে, সমগ্র বিশ্বজনগণের জন্য' সংগ্রাম করিতে অনুরোধ জানাই। তাহাতে আমি ঘোষণা করি যে, উইলসনের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হইয়া গেল 'বুর্জোয়া সমাজের মহান ভাবাদর্শের আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

তারপর তাকাইলাম তরুণ সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে। দেখিলাম কী অপরিমেয় অমানুষিক সংগ্রাম করিয়া এই শিশুরাষ্ট্র বহুশতাব্দীর নাগপাশ ছিন্ন করিতেছে। ইতিপূর্বে পপ্যুলেয়র পত্রিকায় একটি চিঠিতে আমি সোভিয়েট ইউনিনের বিরুদ্ধে আঁতাতের সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 'রুশ বোলশেভিকদের সহিত আমার আন্তর্জাতিক মৈত্রীবন্ধন' পুনরায় জ্ঞাপন করি এবং প্রেক্যুরসোর পুস্তকের শেষ বাক্য ('বিচার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণীর পরিশিষ্ট, আগস্ট, ১৯১৯) বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবরোধ স্থাপনের ফলে রুশ বন্ধুদের স্বাক্ষরলাভের অক্ষমতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া অকুণ্ঠিতভাষায় ঘোষণা করা হয় 'রাশিয়ার ভাবাদর্শই পৃথিবীর অগ্রগামী চিন্তাধারা।'

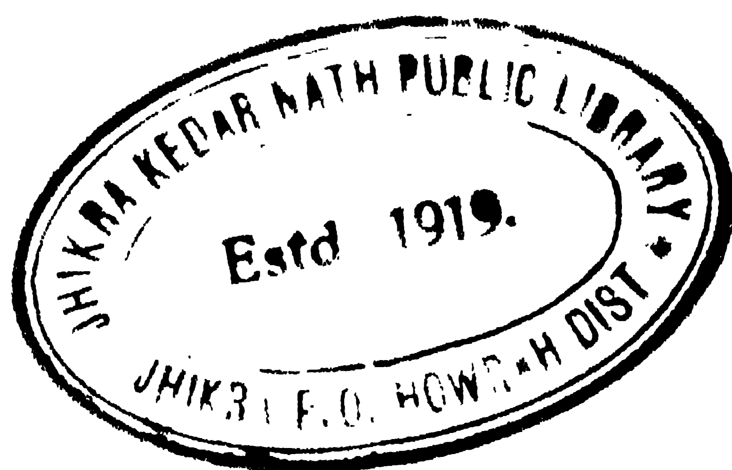
যুদ্ধের পাঁচ বছরের (১৯১৪—১৯) বেদনাময় আমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে আঁ। দস্যু ছ লা মলে ও প্রেক্যুরসোর নামক দুইটি পুস্তিকায়। ১৯১৯ সালের মাঝামাঝি এই প্রতিক্রিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটা অদ্ভুত অবস্থায়—ন যযৌ ন তস্থৌ। এদিকে আমি আশা করিতে লাগিলাম স্বাধীন, সুস্থ, বলিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক মনস্বীতার একটি দুর্গ গড়িয়া তুলিতে পারিব; অন্যদিকে দেখিলাম, কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখে দাঁড়াইয়াছে—ইঙ্গিত দিতেছে সেই লক্ষ্যস্থলের, যেদিকে ইউরোপের অগ্রগামী সৈন্যদল, সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর বিপ্লবীদল চলিয়াছে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া। কম্পাসের কাঁটা নির্দেশ দিতেছে

সেই পথের—যে-পথ সমগ্র মানবসমাজের সামাজিক ও নৈতিক পুনর্গঠনের পথ।

অভিজ্ঞতা আমার আজও শেষ হয় নাই। এই অভিজ্ঞতার পরিশিষ্ট একদিন আমি বলিব *; বলিব কেমন করিয়া মাত্র কয়েকজন ছাড়া ইউরোপের কোনো 'স্বাধীন' মনস্বীই মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। বলিব কেমন করিয়া ইউরোপে পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে ভারতবর্ষের মহাত্মার নিকট স্বাধীন আত্মার বলিষ্ঠ উদ্বোধনের ও নূতন কর্মপথের সন্ধান পাই। বলিব তারপর কেমন করিয়া ঘটনার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিনিতে পারিলাম সেই আদর্শের সংঘাতকে—যাহাকে মার্কস্ অর্থনৈতিক বস্তুবাদের কঠোর আইনের নিগড়ে বাঁধিয়া গিয়াছেন, যাহা আজ পৃথিবীকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ও সর্বহারা শ্রমিকসঙ্ঘ, এই দুই দানবের মধ্যকার গহ্বর দিনের পর দিন বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর করিয়া চলিয়াছে। বলিব কেমন করিয়া এই ঘাত-সংঘাতের ফলেই আজ আমি এই গহ্বর উত্তীর্ণ হইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। বড় শ্রান্তি, বড় বেদনার এ যাত্রা। এ যাত্রা আজও শেষ হয় নাই। এ যেন নাবিক সিন্ধুবাদের যাত্রা। এ যাত্রা যেদিন শেষ হইবে সেদিন বলিব :

"শন্তি, শান্তি, শান্তি। হে আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক, হে আমার ক্লান্ত চরণ দুখানি, ঘুমাও ঘুমাও। তোমরা যা করিয়াছ তাহা চমৎকার। কঠোর, বিপদাকীর্ণ ছিল তোমাদের যাত্রাপথ। তা' হোক, তবু পথই চমৎকার। এমন পথে হাঁটিয়া পা দিয়া রক্ত পড়িলেও সুখ।"

* ইহাই আমি প্রারম্ভে বলিয়াছি



• রম্যাঁ রলাঁ •

বিমুগ্ধ আত্মা

'Soul Enchanted'-এর বাংলায় অনুবাদ

*　　*　　*

'শিল্পীর নবজন্মে' রলাঁ তাঁর যে বেদনাময় আত্মোপলব্ধিকে ব্যক্ত করেছেন প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে, তাকেই তিনি চরিত্র-চিত্রে রূপ দিয়েছেন দীর্ঘ গ্রন্থ 'বিমুগ্ধ আত্মা'র ছ'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ড-উপন্যাসে।

*

অগ্রণী বুক ক্লাব